সত্যিকারের
বামপন্থার
সন্ধানে
পৃঃ - ২৯

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

সার্ধশতবর্ষে
লোকমাতা
ভগিনী
নিবেদিতা
পৃঃ - ২১

৬৯ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা।। ১৬ জানুয়ারি ২০১৭।। ২ মাঘ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

রাজনৈতিক দলের তহবিল কতটা কালো!

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ২ মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

১৬ জানুয়ারি - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

রাজ্যের স্বার্থের চেয়ে মমতা ব্যানার্জীর কাছে দলের কিছু নেতা-নেত্রীর স্বার্থ রক্ষাটা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে

▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : মোদী হটাও, দিদিকে বাঁচাও

▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

ভারতবর্ষের শিয়রে শমন— মোগলিস্তান

▯ প্রণব দত্ত মজুমদার ▯ ১২

রাজনৈতিক দলগুলির আয়-ব্যয়

▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৪

সার্ধশতবর্ষে লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা

▯ আশিস রায় ▯ ২১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

▯ সলিল গেঁউলি ▯ ২৩

সম্পূর্ণ পৃথক পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছে নীতি আয়োগ ▯ অরবিন্দ পানাগড়িয়া ▯ ২৭

সত্যিকারের বামপন্থার সন্ধানে

▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ২৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ সুস্বাস্থ্য: ৩৫ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮▯ রঙ্গম : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

যোদ্ধা গুরু গোবিন্দ সিংহ

স্বামীজী বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেককে গুরু গোবিন্দ সিংহ হইতে হইবে।' যোদ্ধা গুরু গোবিন্দ সিংহ দেশ ও জাতির মঙ্গলে আত্মোৎসর্গের এক চরম উদাহরণ। তাঁর ৩৫০তম জন্মবার্ষিকীতে এই সংখ্যাটি তাঁর প্রতি স্বস্তিকা-র শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে নিবেদিত। লিখেছেন সর্দার গুরুচরণ সিংহ গিল, প্রকাশ সিংহ অটল, তরুণ বিজয় প্রমুখ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

নির্বাচনী তহবিলের স্বচ্ছতা

সম্প্রতি জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনী চাঁদা বা অনুদানের বিষয়টি উত্থাপন করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক কাজকর্মে স্বচ্ছতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই প্রয়াস প্রশংসাযোগ্য। দিল্লির সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজ (সি এম এস) ২০১৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির খরচের পরিমাণ ৩৫ হাজার কোটি টাকা বলিলেও সরকারি হিসাব অনুযায়ী তাহা ৭ থেকে ৮ হাজার কোটির মধ্যে। প্রশ্ন হইল, সরকারি হিসাব বহির্ভূত ২৭-২৮ হাজার কোটি টাকা খরচের উৎস কী? ইদানীং তাই বেশ কয়েকবার প্রধানমন্ত্রী (যেমন সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে নির্বাচনী জনসভায়) নির্বাচনী রাজনীতিতে বিপুল অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার উপর জোর দিয়াছেন। নোট বাতিলের ঘোষণার পর পরই সরকারি অর্থ খরচের মাধ্যমে নির্বাচন হউক—এই প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী সামনে আনিয়াছেন। সেইসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন একই সঙ্গে করিবার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও তিনি উত্থাপন করিয়াছেন। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের রাজনৈতিক দলগুলির রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া জানা যাইলে বিষয়টি লইয়া ব্যাপক বিতর্ক হওয়ার ভিত্তিটি প্রস্তুত হইত। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হইল, কোনো রাজনৈতিক দলই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নাই, বরং মৌনতা অবলম্বন করিয়াছে। কোনো একটি রাজনৈতিক দল তাহাদের আয়ের উৎস হিসাবে ২০ হাজার টাকার পরিবর্তে ২ হাজার টাকা করিয়া চাঁদা দেখাইয়াছে। নির্বাচন কমিশন এই দাবির বিষয়ে এখনও পর্যন্ত মৌন। যদিও নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করিয়াছে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই তাহাদের আয়-ব্যয়ের প্রতিটি পয়সার হিসাব দিতে হইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজনৈতিক দলগুলির তহবিলের উৎস খতাইয়া দেখিবার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের থাকিলেও হিসাবে গরমিল দেখা দিলে দলগুলির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের ক্ষমতা নাই। ইহা স্পষ্ট যে নির্বাচনী সংস্কার লইয়া রাজনৈতিক দলগুলির তেমন আগ্রহ নাই। যতক্ষণ না সরকার এই বিষয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছে ততক্ষণ নির্বাচনী সংস্কারের আশা খুবই কম। যদিও প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন ভারতীয় জনতা পার্টি তাহাদের তহবিলের উৎস সম্পর্কে স্বচ্ছতা বজায় রাখিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

ঘটনা হইল, রাজনৈতিক দলগুলির তহবিলের স্বচ্ছতা না থাকিবার কারণে কিছু রাজনৈতিক নেতা ফুলিয়া-ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন। একটি সরকারি হিসাব অনুযায়ী ২০১৪ সালে পুনর্নির্বাচিত ১৬৫ জন সাংসদ গত পাঁচ বছরে তাহাদের সম্পত্তি বৃদ্ধির পরিমাণ ১৩৭ শতাংশ দেখাইয়াছেন। আয়কর আইনের ১৩এ ধারা অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলির আয় একশো শতাংশ আয়কর মুক্ত। এরই সুযোগ লইয়া এক শ্রেণীর রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী তাহাদের আয়ের উৎস ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলিকে কাজে লাগাইতেছে। এই বিপুল বেনামি গোপন সম্পত্তির হদিশ সন্ধানের জন্য অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলির তহবিলের স্বচ্ছতা বজায় রাখিতে প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানাইয়াছেন।

দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নগদ বিহীন অর্থাৎ 'ক্যাশলেস' লেনদেনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। পথপ্রদর্শক হিসাবে শাসকদল বিজেপি যদি 'ক্যাশলেস' পদ্ধতিতেই আর্থিক লেনদেন করিবে বলিয়া ঘোষণা করে, তবে অন্য রাজনৈতিক দলগুলি স্বাভাবিক ভাবেই চাপে পড়িবে। শুধু তাহাই নয়, বিজেপি যে 'পার্টি উইথ এ ডিফারেন্স' বলিয়া দাবি করিয়া থাকে, তাহাও আর একবার প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাজনীতিকরা দুর্নীতিপরায়ণ হইলে দেশের সমূহ বিপদ এবং দেশ এখন সেই বিপদের মুখোমুখি। এই অবস্থায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সদিচ্ছা প্রয়োজন। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিলে তবেই নির্বাচনী সংস্কারের পথে যাইতে হইবে, ইহা ঠিক নহে। নির্বাচনী ও রাজনীতি সংস্কারের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারের পদক্ষেপ তাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

সুভাষিতম্

পরোপকরণং যেষাং জাগর্তি হৃদয়ে সতাম্।
নশ্যন্তি বিপদস্তেষাং সম্পদঃ স্যুঃ পদে পদে।। (চাণক্য শ্লোক)

যাদের হৃদয়ে পরোপকারের চিন্তা সর্বদাই জাগ্রত থাকে, তাদের বিপদ বিনষ্ট হয় এবং পদে পদে সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

বিমুদ্রাকরণের প্রভাব পড়েনি রাজস্ব আদায়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন বিমুদ্রাকরণের ফলে তাঁর রাজ্য ৫০০০ কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে। অভিযোগের জবাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছিলেন রাজস্বের ক্ষতি হলে তার জন্য দায়ী প্রশাসনিক অপদার্থতা; বিমুদ্রাকরণের সিদ্ধান্ত নয়।

কার্যত অর্থমন্ত্রীর কথাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি সরকারি একটি সূত্র জানিয়েছে বিমুদ্রাকরণের পর বেশ কয়েকটি রাজ্য রাজস্ব আদায়ে তাদের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ১৭টি থেকে তথ্য পাওয়া গেছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ মেঘালয় এবং অরুণাচলের অবস্থা সব থেকে করুণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাসেও এই তিনটি রাজ্য ভ্যাট এবং কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আদায়ে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল। সরকারি তথ্য অনুযায়ী বিমুদ্রাকরণের পর রাজস্ব আদায়ে সব থেকে বেশি সাফল্য অর্জন করেছে জম্মু ও কাশ্মীর।

ভ্যাট এবং কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আদায়ে বৃদ্ধির (%) হার

শীর্ষস্থানে	(নভেম্বর, ২০১৬)	শীর্ষস্থানে	(ডিসেম্বর, ২০১৬)
নাগাল্যান্ড	১৩৩	জম্মু ও কাশ্মীর	১১২
জম্মু ও কাশ্মীর	৮২	অসম	২০
মধ্যপ্রদেশ	৩২	মহারাষ্ট্র	১৭
উত্তরাখণ্ড	২৯	ছত্তিশগড়	১৬
ছত্তিশগড়	২৮	মধ্যপ্রদেশ	১৩
মহারাষ্ট্র	২৬	তামিলনাড়ু	১১
পিছিয়ে	**(নভেম্বর, ২০১৬)**	**পিছিয়ে**	**(ডিসেম্বর, ২০১৬)**
অরুণাচল প্রদেশ	–১২	অরুণাচল	–৮১
ত্রিপুরা	–৩	মেঘালয়	–৬৬
মিজোরাম	–২	পশ্চিমবঙ্গ	–৮
ওড়িশা	৬	রাজস্থান	১
তামিলনাড়ু	১০	ওড়িশা	২

বড় রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্র। নভেম্বরে রাজস্ব আদায়ে বৃদ্ধির হার ডিসেম্বরে খানিকটা কমলেও তা কখনওই ন্যূনতম মাত্রা অতিক্রম করেনি। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, নভেম্বরের ৮ তারিখে নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পর বাতিল নোট ব্যবহার করার ছাত্রপত্র দেওয়া বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে দেদার বাতিল ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট খরচ করে অনেকেই অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রক্রিয়াটি বজায় রেখেছিলেন। তাই নভেম্বরে রাজস্ব আদায়ে (ভ্যাট) উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু নভেম্বরের শেষে এবং ডিসেম্বরের শুরুতে নতুন নোটের সাময়িক সঙ্কট দেখা দেওয়ায় এই প্রক্রিয়ায় সামান্য ভাটা পড়ে। ডিসেম্বরে রাজস্বের পরিমাণও কিছুটা কমে যায়। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে ১০ লক্ষ কোটি টাকার নতুন নোট বাজারে ছাড়া হয়েছে। নোটের আকাল যে আর তত নেই সেটা ব্যাঙ্ক আর এটিএমগুলো লক্ষ্য করলেই বোঝা যাচ্ছে। তাই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যে আরও বাড়বে সে ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু গত ৩৯ বছর ধরে নেতিবাচক রাজনীতিতে জীর্ণ পশ্চিমবঙ্গের তাতে কতটা উন্নতি হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। ■

নোবেল পেলে ১০০ কোটির পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইংরেজিতে যাকে 'প্রো-অ্যাকটিভ' বলে, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এক কথায় তাই। সম্প্রতি তিনি ঘোষণা করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের কোনো বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদ যদি নোবেল পুরস্কার পান তাহলে তাঁর সরকার তাকে ১০০ কোটি টাকা পুরস্কার দেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চন্দ্রবাবু নাইডুর প্রস্তাবিত পুরস্কারমূল্য নোবেল কমিটির পুরস্কারমূল্যের (৫.৯৬ কোটি টাকা) থেকে প্রায় ১৭ গুণ বেশি। সম্ভবত এর আগে কখনও কোনো রাজ্য সরকার এমন বিপুল অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেনি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার চন্দ্রবাবু নাইডু রাজ্যের বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দিতে পুরস্কার ঘোষণা করলেন। এর আগে দশ কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। তিরুপতিতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১০৪তম সম্মেলনে চন্দ্রবাবু নাইডু নোবেলজয়ী জাপানি অধ্যাপক তাহাকি কাজিতার কাছে নোবেল পুরস্কার জেতার উপায় জানতে চান। তিনি বলেন অল্প সময়ের মধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশের প্রায় ৫০ হাজার স্কুলকে মানা টিভি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে। স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান এবং সাধারণ ওষুধপত্র সংক্রান্ত বিশেষ পাঠক্রম চালু করার কথাও ভাবছে তার সরকার। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথা মাথায় রেখে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ছাত্রদের কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ রাজ্যের প্রায় ৩০০০ স্কুলে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

ভিয়েতনামকে অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির চুক্তি করছে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভিয়েতনামের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভারতে তৈরি মাটি থেকে আকাশে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপযুক্ত 'আকাশ' ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করার এক দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করার পথে উভয়দেশ অনেকটাই এগিয়ে

করমর্দনরত দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী।

গেছে বলে খবর। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের খবরদারি দু' দেশই নিজেদের নিরাপত্তার পক্ষে অনুকূল মনে না করাতেই এই পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনের পথ নেওয়া হয়েছে। সূত্রে প্রকাশ এই বছর থেকেই ভারতের 'সুখোই MKI' যুদ্ধ বিমানগুলির মাধ্যমে ভিয়েতনামের সামরিক পাইলটদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত ৪৮ দেশের পারমাণবিক রসদ সরবরাহকারী দেশগুলির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে ভারতকে লাগাতার বাধা দেওয়া, কট্টর জঙ্গি জয়েস-ই-মহম্মদ দলের মাসুদ আখতারকে সন্ত্রাসবাদী বলে ঘোষণার বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে বাধা দান ও বর্ধিত শক্তির নৌবহর নিয়ে ভারত মহাসাগরে উপস্থিত বাড়িয়ে চীন ভারতের ওপর যে চাপ বাড়াচ্ছিল তারই পাল্টা হিসেবে ভারত দ্রুত চীনের আশেপাশে থাকা দেশগুলির সঙ্গে সামরিক সখ্য বাড়াবার নীতি নিয়েছে।

বিবেকানন্দ যোগ অভ্যাস সংস্থা (VYAS)

যোগাসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা, আবর্তনধ্যান ও যোগানিদ্রার অনুশীলন কেন্দ্র

স্থান : কেশব ভবন

৯এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার , সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা (মহিলা)

সন্ধ্যা ৭.৩০ মি. থেকে ৮.৩০ মি. (পুরুষ)

নাম নথিভুক্ত করার ফি—১০০.০০, এছাড়া মাসিক ফি—১০০.০০

—ঃ যোগাযোগ ঃ—

বিভাস মজুমদার—৯১৪৩০৮২৭৩১, আশিস পাল—৮৪২০২৯০৩৯৩

মনরেগা প্রকল্পে কাজের পরিমাণ ৬০ শতাংশ বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মনরেগা প্রকল্পে গত ডিসেম্বর মাসে গড় কাজের চাহিদা ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে খবর। নোট বাতিলের পর সাময়িক কর্মচ্যুতিকে পুষিয়ে নিতেই এই বাড়তি চাহিদা এমনটাই জানাচ্ছেন একেবারে তৃমমূল স্তরের পরিসংখ্যান সংগ্রহকারী কেন্দ্রীয় আধিকারিকরা। গ্রাম উন্নয়নমন্ত্রক থেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী জুলাই থেকে নভেম্বর ১৬-এর মধ্যে সারা দেশে প্রতিদিন কাজের চাহিদায় গড় শ্রমিক উপস্থিতির হার ছিল ৩০ লক্ষ। ডিসেম্বর মাসে গড়ে প্রতিদিন কাজে যোগ দিতে আসা শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ লক্ষ। বছর ফুরতেই ৭ জানুয়ারি ২০১৭ সালে এই সংখ্যা এক লাফে পৌঁছে যায় ৮৩.৬০ লক্ষে। এই সংখ্যাটি জুলাই থেকে নভেম্বরের গড়ের প্রায় তিনগুণ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নোট বাতিল হওয়া ঘোষণার আগের দিন ৭ নভেম্বর ৩৮.৫২ লক্ষ শ্রমিক কাজে যোগ দিয়েছিল। গত ডিসেম্বর ২ তারিখে এই সংখ্যা কিছুটা কমে দাঁড়ায় ৩৫.৬০ লক্ষে। কিন্তু তার পরবর্তী পর্যায়ে এই সংখ্যা লাগাতার বাড়তে থাকে ও চলতি মাসের ৭ তারিখে বিগত (এপ্রিল-নভেম্বর) ৮ মাসের গড় টপকে ৮৩.৬০ লক্ষে পৌঁছয়।

প্রসঙ্গত, এই বড় ধরনের বৃদ্ধির পেছনে বড় অঙ্কের 'নোট' বাতিল ঘোষণার' ফলে সাময়িক কর্মচ্যুত শ্রমিকের বাড়তি যোগদানের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে তা নিশ্চয় অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দেশব্যাপী যে প্রচার হলো গ্রামীণ রোজগার প্রকল্পে কাজ না পেয়ে মানুষ অনাহারে পড়ছে তা অসত্য প্রচারই ছিল। এই খবরটির সারাৎসার হিসেবে আরও যে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যটি উঠে আসছে তা হলো গড় শ্রমিকের তুলনায় তিন গুণ শ্রমিকের মজুরি কীভাবে দেওয়া হলো? তাহলে বাজারে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের যোগানও নিশ্চয় ছিল। যে সমস্ত শ্রমিকের ব্যাঙ্ক খাতা ছিল তারা সেখানে টাকা পেয়েছে। সেই পরিমাণ টাকা তোলার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে কোনো নিষেধাজ্ঞাও ছিল না। অন্যদিকে যারা নগদ ছাড়া নিতে পারেনি তাদের টাকার যোগান এল কোথা থেকে? শ্রমিকরা নিশ্চয় বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেনি। মিথ্যা প্রচারের অপকৌশল ফাঁস করতে খবরটির গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কেননা খবরের উৎস সরকারি মন্ত্রক।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

ভারতের আর্থিক বিকাশে আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের উদ্বোধন মোদীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে একের পর এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিচ্ছেন তারই অঙ্গ হিসাবে গত ৯ জানুয়ারি ভারতে প্রথম আন্তর্জাতিক মানের শেয়ার বাজার 'ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ'-এর উদ্বোধন করলেন তিনি। গুজরাটের গান্ধীনগরে গুজরাট ইন্টারন্যাশনাল টেক-সিটিতেই (জি আই এফ টি বা গিফট) স্থাপিত হয়েছে শেয়ার লেনদেনের এই আন্তর্জাতিক বাজারটি। মোদী তাঁর বক্তৃতায় এই উদ্বোধনটিকে 'স্মরণীয় মুহূর্ত' আখ্যা দিয়ে বলেন, 'ভারত অসাধারণ একটি সময়-সারণিতে রয়েছে। এবং এই মুহূর্তে আমাদের দেশের যা ক্ষমতা তাতে দিনের মধ্যে ২২ ঘণ্টা শেয়ার কেনাবেচার কারবার খোলা রাখতে কোনো অসুবিধা হবে না। এর ফলে আমরা দিনের সেই সময়েই শেয়ার

কেনা-বেচা শুরু করতে পারব যখন জাপানে মার্কেট শুরু হবে এবং তখনই আমাদের শেয়ার বেচা-কেনা বন্ধ হবে যখন আমেরিকার বাজার বন্ধ হয়ে যাবে।' শেয়ার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এর ফলে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারত কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে। বর্তমানে মুম্বই স্টক মার্কেটও আন্তর্জাতিকস্তরে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তবে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের তাবড় শেয়ার বাজার যেমন সিঙ্গাপুর, হংকং, লন্ডন ও নিউ ইয়র্কের সঙ্গে তুলনীয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য আগামী ২০ বছরে ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করতে হলে অন্তত ৩০ কোটি কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। মুম্বই স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান সুধাকর রাও জানিয়েছেন ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের সঙ্গে যৌথভাবে আগামী পাঁচ বছরে ২০ হাজার যুবকের কাজের সংস্থান করবে। সব মিলিয়ে অর্থনীতির এই নয়া দিশায় কর্মসংস্থান প্রকল্প-ই সবচেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রসঙ্গত, গুজরাটের গান্ধীনগরে গিফট সিটি দেশের প্রথম স্মার্ট শহর। এবং আধুনিক পরিকাঠামোর দিক দিয়েও আন্তর্জাতিক মানের। মোদীর ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্নও এর দ্বারা বাস্তবায়িত হবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

২০১৮-য় রাজ্যসভার পাটিগণিত বদলাতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ফেব্রুয়ারি-মার্চে পাঁচ রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনের ফলাফলে রাজ্যসভার পাটিগণিতে এ বছর তেমন প্রভাব না পড়লেও জুলাইয়ে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নিশ্চিতভাবে পড়বে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন শুধু ২৯টি রাজ্য ও দুটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের বিধায়ক এবং সংসদের দুই কক্ষের নির্বাচিত সাংসদেরা। সুতরাং উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, মণিপুর এবং গোয়ায় আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল যে এই নির্বাচকমণ্ডলীর দলগত বিন্যাসে যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের ৪০৩টি আসনবিশিষ্ট বিধানসভার নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক, তার কোনো প্রভাব আগস্টে অনুষ্ঠিতব্য উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পড়বে না। তার কারণ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শুধু নির্বাচিত সাংসদরাই ভোট দিতে পারেন। বিধায়কদের সেখানে কোনো ভূমিকা নেই।

২০১৮ সালে রাজ্যসভার মোট ৬৮ জন সাংসদ অবসর নেবেন। তার মধ্যে ১০ জন উত্তরপ্রদেশের। ৫৮ জনের অবসর এপ্রিলের মধ্যেই হয়ে যাবে বলে জানা গেছে। যে-পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন হতে চলেছে তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশের ১০টি সাংসদ-পদ শূন্য হবে, ১টি হবে উত্তরাখণ্ডে। বর্তমান সরকারের শাসনকালে অর্থাৎ ২০১৯-র মে অবধি, পঞ্জাব ও মণিপুরে কোনো পদ শূন্য হবে না। সুতরাং উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে যদি বিজেপি জয়লাভ করে তাহলে রাজ্যসভার পাটিগণিত সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। তাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিল পাশ করানোর ক্ষেত্রে যে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে তা আর থাকবে না।

গোয়ার একমাত্র সাংসদ-পদটি শূন্য হবে এ বছর জুলাই-এর ২৮ তারিখে। ২০১৭-র আগস্টে আরও ৯টি সাংসদ-পদ শূন্য হবে। তার মধ্যে রয়েছে গুজরাটের ৩টি এবং পশ্চিমবঙ্গের ৬টি পদ। তবে তাতে রাজ্যসভার সাংসদদের দলগত বিন্যাসে বিশেষ কোনো হেরফের হবে না। যদিও রাজ্যসভায় এন ডি এ-র সাংসদ-সংখ্যা (৭৪) ইউপিএ-র (৭১) থেকে সামান্য হলেও বেশি কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার (১২৩) থেকে অনেকটাই দূরে। গত বছর রাজ্যসভার দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে এনডিএ কিছুটা উপকৃত হয়েছে কিন্তু তা যথেষ্ট নয়।

২০১৮-য় উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের পাশাপাশি দিল্লি, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, বিহার, গুজরাট, তেলেঙ্গানা, রাজস্থান, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং সিকিম থেকে মনোনীত বেশ কয়েকজন সাংসদও অবসর নেবেন। যেহেতু ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং হরিয়ানায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তাই ওইসব রাজ্যের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে এনডিএ-র লাভ হওয়ারই সম্ভাবনা। এছাড়া ২০১৮-র এপ্রিলে চিত্রতারকা রেখা এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার শচীন তেণ্ডুলকর-সহ আরও চারজন সাংসদ অবসর নেবেন। তাতেও এনডিএ-র লাভ দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিদ্যার্থী পরিষদের প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক পদে যথাক্রমে ড. নাগেশ ঠাকুর এবং বিনয় বিদরে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। সম্প্রতি ইন্দোরে অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী

ড. নাগেশ ঠাকুর

বিনয় বিদরে

পরিষদের জাতীয় সম্মেলনে দুই নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও সচিব কার্যভার গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই ড. নাগেশ ঠাকুর ছাত্র রাজনীতি করে আসছেন। হিমাচল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি করার পর এখন তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক। অন্যদিকে, বিনয় বিদরে পেশায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। রয়েছে সাংবাদিকতার ডিপ্লোমাও।

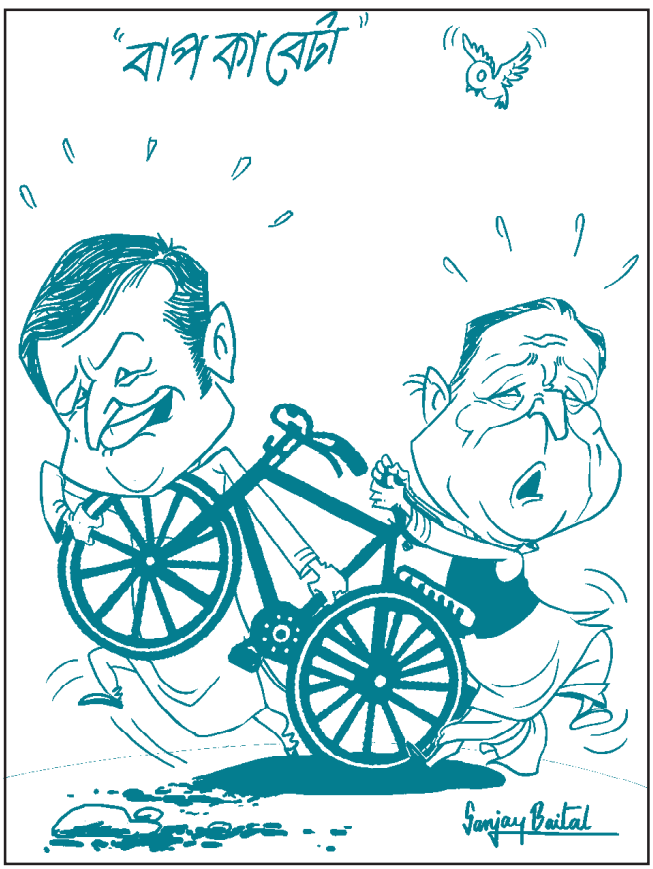

উবাচ

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

“বিদেশে প্রবাসী ভারতীয়রা কেবল ভিড় বাড়ান না। তাদের অবদান সেখানে সম্মানিত হয়। প্রবাসী ভারতীয়রা যে দেশেই থাকুন সেই দেশই তাদের কর্মভূমি। আবার ভারতের বিকাশযাত্রারও তারা অংশীদার। স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের সম্পর্ক তৈরিতে প্রবাসী ভারতীয়দের প্রয়াসকে আমি স্বাগত জানাই।”

বেঙ্গালুরুতে প্রবাসী ভারতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে।

অরুণ জেটলি
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

“প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাহুল গান্ধীর মধ্যে পার্থক্যটা বেশ স্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রী দেশের আগামী প্রজন্মের কথা ভাবতে চান আর রাহুল গান্ধী ভাবতে চান কীভাবে লোকসভার পরের অধিবেশনটাও বরবাদ করে দেওয়া যায়।”

নোট বাতিলকে কেন্দ্র করে রাহুল গান্ধীর বিরোধিতা প্রসঙ্গে।

মেহবুবা মুফতি
জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী

“কাশ্মীরি পণ্ডিত কলোনি ও সৈনিক কলোনি ইস্যুতে হৈচৈ বাধিয়ে লাভ হলো না দেখে পাকিস্তান এবং এখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা কাশ্মীরে বুরহান ওয়ানির মৃত্যু-পরবর্তী অশান্তির ছক কষেছিল। এর পুরোটাই পূর্ব-পরিকল্পিত।”

বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর জম্মু-কাশ্মীরে অশান্তি প্রসঙ্গে।

আন্তোনিও কোস্তা
পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী

“আমার বাবা এক সময় মাডগাঁওয়ে থাকতেন। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে সেখানে। পরে উনি ভারত ছেড়ে চলে যান ঠিকই কিন্তু ভারতের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ কোনোদিন নষ্ট হয়নি। নিজেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলতে আমি গর্ববোধ করি।”

বেঙ্গালুরুতে প্রবাসী ভারতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে।

রাজ্যের স্বার্থের চেয়ে মমতা ব্যানার্জীর কাছে দলের কিছু নেতা-নেত্রীর স্বার্থ রক্ষাটা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে

কমপক্ষে পনেরো হাজার কোটি টাকার ঘাপলা করা রোজভ্যালি চিটফান্ডের সঙ্গে তৃণমূলের নেতানেত্রীরা যে যুক্ত তাতে দেশের মানুষের সামান্যতম সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, এরা চোরচোট্টা হয়েও ভোট পায়। ভোটে জিতে ক্ষমতায় ফিরে আবার ডবল চুরি জালিয়াতি করে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের সম্পত্তির পরিমাণ ৬০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় ফেরার পর। আমরা যদি জেনেশুনে সারদা, রোজভ্যালি, এমপিএস ইত্যাদি দুনম্বরি চিটফান্ডের মাধ্যমে তৃণমূলের যে নেতা নেত্রীরা রাজ্যের গরিব মানুষকে ঠকিয়ে হাজার কোটি টাকা নিজেদের পকেটে পুরেছে তাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় ফেরাই তবে এখন কপাল চাপড়ে লাভ নেই। কথাটা বলতে হচ্ছে, কারণ তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করার ঘটনায় রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের সমাজবিরোধীরা যে দাঙ্গা হাঙ্গামা চালিয়েছে তাতে মনে হতে পারে সুদীপবাবু মস্ত বড় দেশপ্রেমিক সমাজসেবী। সিবিআই আদালতে যেসব নথিপত্র জমা দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূলের দুই দাদা সাংসদ রোজভ্যালি এবং সারদার ঘাপলার প্রধান মদতদার ছিল। ভাউচার সই করে কোটি কোটি টাকা নগদে তারা নিয়েছে সেই নথি আদালতে জমা দিয়েছে সিবিআই।

২০১৫ সালের ১৪ জুলাই রোজভ্যালির কর্ণধার গৌতম কুণ্ডু লিখিতভাবে যে জবাব এনফোর্সমেন্ট ডাইরেকটোরেটকে দিয়েছিলেন তাতে জানা যাচ্ছে যে রাজ্যের চারজন মন্ত্রী, এক বিধায়ক, একজন পুরপ্রধান, দু' জন সাংসদ, একটি চলচ্চিত্র সংস্থার কর্তা এবং টিএমসিপির প্রাক্তন সভাপতি এই চিটফান্ডে গরিবের জমা টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। জেলখাটা রাজ্যের এক প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন পালের গোদা। অভিযোগ, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সুদীপবাবু সস্ত্রীক বহুবার বিদেশ সফর করেছেন। তিনি দুটি বিলাসবহুল গাড়ি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রোজভ্যালির টাকায় উপহার নিয়েছেন। গৌতম কুণ্ডু লিখিত বয়ানে বলেছেন, সুদীপবাবু তাঁর

গূঢ় পুরুষের

কলম

সাংসদ ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে রোজভ্যালির ব্যবসা বাড়াতে সাহায্য করেছেন। এই সাংসদের গ্রেপ্তারের পর তৃণমূল সমর্থকরা টানা তিনদিন রাজ্যজুড়ে অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে, বিজেপি অফিসে হামলা চালিয়েছে। কথায় আছে যে চোরের মায়ের বড় গলা। যেহেতু সুদীপবাবুর মাতৃদেবী প্রয়াত তাই এখানে মায়ের বদলে পড়তে হবে দিদি। রাস্তায় নেমে গুণ্ডাবাজি করলে আইনের প্রক্রিয়া বন্ধ করা যায় না। আইন ও বিচার সংবিধানের নির্দেশেই চলবে। রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী মদন মিত্র সারদাকাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়ার পর দিদির নির্দেশে দলের সমর্থকরা জোরদার বিক্ষোভ দেখায়। তার ফলে সিবিআই মদন মিত্রকে প্রভাবশালী তকমা লাগিয়ে প্রায় দু'বছর জেলে বন্দি রাখে। সুদীপবাবুর সমর্থনে যেভাবে হিংসাত্মক বিক্ষোভ হয়েছে তাতে স্পষ্ট যে তিনি মদন মিত্রের থেকে অনেক বেশি প্রভাবশালী। তাই সুদীপবাবুর পক্ষে সহজে জামিনে মুক্ত হওয়াটা কঠিন হয়ে গেছে।

দিদিভাই এতদিন জাতীয় স্তরে ফেডারেল ফ্রন্টের স্বপ্ন দেখছিলেন। এখন বলছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে সরিয়ে দিয়ে কেন্দ্রে জাতীয় সরকার গড়তে হবে। বিজেপির প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণী, রাজনাথ সিংহ অথবা অরুণ জেটলিকে প্রধানমন্ত্রী করে সর্বদলীয় প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাতীয় সরকার গড়তে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে রাষ্ট্রপতিকে। দিদিভাই একটু কষ্ট করে ভারতের সংবিধানটা পড়ুন। দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। দিদি যতই প্রণবদা প্রণবদা বলে আবদার করুন না কেন আখেরে তাতে লাভ নেই। আমাদের রাজ্যের মানুষের দুর্ভাগ্য যে, এখানে এমন একজন নেত্রী প্রশাসনের শীর্ষে বসে লাঠি ঘোরাচ্ছেন যাঁর দেশের সংবিধান সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানটুকুও নেই। দিদিভাই নির্দেশ দিয়েছেন যে, সুদীপের গ্রেপ্তারের পর ভবিষ্যতে তাঁর দলের কোনও সাংসদ, বিধায়ক, নেতা নেত্রী সিবিআইয়ের তলব পেলে হাজিরা দেবেন না। এই রাজ্যে সিবিআইকে কাজ করতে দেওয়া হবে না। রাজ্যে চালু কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজকর্ম দেখার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা এলে জেলা শাসকরা সহযোগিতা করবেন না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এলে রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তারা বৈঠকে যেতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের চিঠির জবাব দিতে গেলে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন নিতে হবে। অর্থাৎ, দিদি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চালু করে দিয়েছেন। এতে ক্ষতিটা কিন্তু রাজ্যের। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সিংহভাগই চলে কেন্দ্রের আর্থিক অনুদানে। মমতা কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়ে রাজ্যকে চরম দুর্দশায় ঠেলে দিতে চাইছেন। রাজ্যের স্বার্থের থেকে তাঁর কাছে দলের কিছু দুর্নীতিবাজ নেতার স্বার্থরক্ষাটা বড় হয়েছে। দিদি ও তাঁর দলবলেরা বিজেপির প্রতিহিংসার তত্ত্ব খাড়া করতে চাইছেন। অথচ চিটফান্ড সংস্থাগুলির প্রতারণার মামলার তদন্তের দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অনেক আগে। সিবিআই তদন্তে বাধা দিয়ে তৃণমূল নেত্রী শীর্ষ আদালতকেই চ্যালেঞ্জ করছেন। ■

মোদী হঠাও, দিদিকে বাঁচাও

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

আপনি যদি মনে মনে বা প্রকাশ্যে নরেন্দ্র মোদীকে ভালবেসে থাকেন তবে মন বদলান। দিদি মোদীকে চান না। অতএব মোদীকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে। দিদি ক্ষমতা চান না। তাই তিনি নিজের নাম বলেননি। কিন্তু আসুন আমরা সবাই মিলে জাতীয় সরকারের দাবি তুলি। আর তাতে দিদিকে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। দিদিকেই। অন্য কাউকে নয়।

দিদি যদিও বলেছেন, মোদীকে সরিয়ে লালকৃষ্ণ আদবাণী, অরুণ জেটলি বা রাজনাথ সিংহের মধ্যে কোনও এক জনকে যদি প্রধানমন্ত্রী করা হয়, তাহলে সেই সরকারকে সমর্থন দিতে তাঁর আপত্তি নেই। কারণ, মোদীর মতো বিপজ্জনক ব্যক্তিকে দেশের প্রশাসনিক প্রধানের পদ থেকে সরানো জাতীয় স্বার্থেই আবশ্যক হয়ে উঠেছে। দিদির এই দাবি শুনে আপনি হয়তো ভাবছেন দিদির সমর্থনের দরকার কী? এমনিই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ মোদী। তার আবার দিদিকে চাই কেন! ওসব ভাবলে চলবে না। দিদি বলেছেন অতএব দিদির সমর্থন মোদীর জরুরি।

মমতার এহেন প্রস্তাব অবশ্য 'আজগুলি কথা' বলে উড়িয়ে দেবেন না প্লিজ। চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ভাববেন না, বরং জাতীয় সরকার কী করে করা যায় সেটা ভাবুন। বিভিন্ন কেলেঙ্কারির তদন্ত বন্ধ করাতেই এখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন মমতা! না, এমনটা ভাববেন না। দোহাই আপনাদের। আমার দিদিকে একটু সুস্থ থাকতে দিন।

দিদি প্রধানমন্ত্রীকে পরোক্ষে কালিদাসের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, ''রাষ্ট্রপতির কাছে বারবার অনুরোধ করছি, রাজ্যগুলিকে বাঁচান। দেশকে বাঁচান। প্রয়োজনে জাতীয় সরকার তৈরি হোক। প্রধানমন্ত্রী পদে যিনি রয়েছেন, তিনি কিছুই পারবেন না। যে ডালে বসে রয়েছেন, সেটাই কেটে ফেলছেন।'' এর পরেই তিনি বলেন, ''বিজেপি-র মধ্যে থেকেই লালকৃষ্ণ আদবাণী, রাজনাথ সিংহ বা অরুণ জেটলির মতো কোনও প্রবীণ নেতা জাতীয় সরকারের দায়িত্ব নিলে আমার আপত্তি নেই।'' মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অপব্যবহার করা হচ্ছে। যেভাবে দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হচ্ছে তা সন্ত্রাসের থেকেও ভয়ঙ্কর! ঠিকিই তো বলেছেন দিদি। সিবিআই সারদা, নারদা ধরে টানাটানি করবেন কেন? তৃণমূল নেতারা টাকা খেয়েছেন বেশ করেছেন? রাজ্যের টাকা খেয়েছেন, কেন্দ্রের তাতে কী!

দিদির সমালোচকরা অনেকে বলছেন, জাতীয় সরকার গঠনের বিষয়টি কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতো! তা বলে আপনারাও ওসব ভাববেন না। দিদির কথা মাথায় রাখুন। সাংবাদিকদের সামনে দিদি তাঁর এই দাবির কারণ ব্যাখ্যাও করেছেন। তিনি বলেন, ''রাজ্যে অব্যবস্থা হলে যেমন রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি ওঠে, আমি চাই, তেমন ভাবে কেন্দ্রীয় স্তরেও রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হোক। এই সম্ভাবনা এখন বিচার করার সময় এসেছে। আমার গলা কেটে দিলেও আমার কিছু যায় আসে না। নোটবন্দির বিরুদ্ধে আমি বলে যাব। বলব না তো কি! ফুল-বেলপাতা দিয়ে মোদী-পুজো করব!''

ঠিকই তো বলেছেন। মোদীও দিদিকে পূজারি বলেছেন। তবে বাঁকা মন্তব্য করে। মোদীর কথায়, ''কিছু 'রাজনৈতিক পূজারি', যাঁরা কালোটাকার পুজো করেন, তাঁরা সরকারের পদক্ষেপকে 'জনবিরোধী' আখ্যা দিচ্ছেন। অথচ, দীর্ঘদিন রাজনৈতিক ব্যবস্থা, প্রশাসন ও সমাজকে ফোঁপরা করে চলেছে এই কালোটাকা।''

মোদীর এসব কথায় ভুলবেন না। আসুন আমরা সবাই মিলে দিদির পাশে থাকি। বলুন, 'দিদি তুমি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার পাশে আছি।'

—**সুন্দর মৌলিক**

ভারতবর্ষের শিয়রে শমন—মোগলস্তান

প্রণব দত্ত মজুমদার

ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করবার জন্য তিনটি বড় শক্তি পরিকল্পিত ভাবে দেশের অভ্যন্তরে কাজ করে চলেছে। এই তিন শক্তি হলো— (১) চীনের মদতে মার্কসবাদী, মাওবাদী শক্তি, (২) ইউরোপ-আমেরিকার মদতে খ্রিস্টান মিশনারিদের শক্তি এবং (৩) প্যান-ইসলামিক জিহাদি শক্তি। এদের মদত দিচ্ছে সৌদি আরব, কুয়েত, পাকিস্তান-সহ অন্যান্য ইসলামিক রাষ্ট্র। এই তিনটি শক্তিই ভারতবর্ষে ভীষণ ভাবে সক্রিয় এবং এই তিনটি শক্তিই ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক, আমি এখানে প্যান-ইসলামিক জিহাদি শক্তির ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করবো। কারণ এই প্যান-ইসলামিক জিহাদি শক্তির বিরুদ্ধে এখনি ব্যবস্থা না নিলে ভারতবর্ষ আবারও টুকরো হবে। ভারতবর্ষকে আবারও টুকরো করে মোগলস্থান গঠন করবার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে বিভিন্ন ইসলামিক জিহাদি গোষ্ঠী।

এই জিহাদি গোষ্ঠী ঠিক করেছে ভারতের পশ্চিমে ইসলামি দেশ পাকিস্তান, আর পূর্বে ইসলামি দেশ বাংলাদেশ, এর মাঝে একটি মুসলিম করিডোর মোগলস্থান তৈরি করবে। তার ম্যাপও তৈরি করে ফেলেছে জিহাদিরা। ম্যাপের সীমানা বাংলাদেশ থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের অংশ, দিল্লি, হরিয়ানা ও পঞ্জাবের অংশ, গুজরাট ও রাজস্থানের অংশ, জম্মু ও কাশ্মীর হয়ে পশ্চিমে পাকিস্তান পর্যন্ত।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলার দরকার। ১৯৪৭ সালে যখন দেশ ভাগ হয়েছিল, তখন অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক সরকার ছিল মুসলিম লীগের হাতে। অবিভক্ত বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা ছিল হিন্দুদের থেকে কয়েক শতাংশ বেশি। সেই কারণে মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্না সমস্ত বাংলাটাকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। গান্ধীজী বা নেহরুর খুব একটা আপত্তি ছিল না। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী উপলব্ধি করেছিলেন এটা হলে মুসলিম লীগের জিহাদিদের হাতে বাঙালি হিন্দুর অস্তিত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তাই বাঙালি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলি ভাগ করে ভারতভুক্ত করার জন্য তিনি তীব্র আন্দোলন সংঘটিত করেছিলেন। অনুরূপ ভাবে পঞ্জাবি শিখদের জন্য পঞ্জাবের একটি অংশেরও ভারতভুক্তির দাবি করেছিলেন ড. মুখার্জী। তাঁর তীব্র আন্দোলনের ফলে বাংলা ও পঞ্জাব ভাগ হয়ে একটি করে অংশ ভারতভুক্ত হয়েছিল। বাংলার বাঙালি হিন্দু অধ্যুষিত যে এলাকাগুলি ভারতভুক্ত হয় সেটাই পশ্চিমবঙ্গ। মুসলমান জিহাদিরা ঠিক করেছে এই অংশগুলো তারা এবার দখল করে নেবে। পাকিস্তানের জনক মহম্মদ আলি জিন্না শুধুমাত্র কোরানভিত্তিক পাকিস্তান আদায় করেই ক্ষান্ত ছিলেন না; বরং জিন্নার লক্ষ্যটা একজন প্রকৃত ইসলামপন্থীর মতোই সুদূরপ্রসারী ছিল। ভারত এবং পাকিস্তান এই দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র জন্ম নিলেও, জিন্না চেয়েছিলেন ভারতের অভ্যন্তরে এমন কিছু কট্টর ইসলামপন্থী মানুষ থেকে যাক যারা নাগরিকত্বে হবে ভারতীয় কিন্তু মানসিক ভাবে হবে পাকিস্তানি। যাদের কাজই হবে ভারতের অভ্যন্তরে কোরানভিত্তিক ইসলামিক রাষ্ট্রের ভাবনাটিকে জিইয়ে রাখা এবং কৌশলে সেই কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাতে ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতকে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৪৭ সালে কেরলের মোপলা মুসলমান গোষ্ঠী (যারা ভয়ানক মৌলবাদী এবং ১৯২১ সালে দক্ষিণভারতের মালাবার অঞ্চলে যারা শতশত হিন্দুদের হত্যা করেছিল এবং শতশত হিন্দু রমণীর ইজ্জত নষ্ট করেছিল। ইতিহাসে ঘটনাটি মোপালা বিদ্রোহ নামে লেখা হয়েছে। আসলে এটি ছিল একটি ইসলামি জিহাদ।) জিন্নার সঙ্গে দেখা করতে গেলে, জিন্না তাদের ভারতে থেকে যেতে বলেন এবং পৃথক মোগলস্থানের দাবিতে লড়াই করতে বলেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ১৯৪৫ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষে যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে ৯৫ শতাংশ মুসলমান মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিল অর্থাৎ এরা পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিল কিন্তু স্বাধীনতার সময় দেশ যখন ভাগ হলো তখন তারা সবাই পাকিস্তানে গেল না। তারা যখন দেখল যে পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হয়েছে কিন্তু ভারতবর্ষ সেকুলার রাষ্ট্র, আবার নেহরু-লিয়াকত চুক্তির ফলে ভারতবর্ষে সংখ্যালঘুদের বহালতবিয়তে থাকার রক্ষাকবচের ব্যবস্থাও হয়েছে। সেকুলার দেশ ভারত, হিন্দুদের নিয়মকানুন পরিবর্তিত হচ্ছে, কিন্তু মুসলমানদের তোয়াজ করার জন্য তাদের ইসলামি কানুন 'শরিয়ত' সেকুলার ভারতবর্ষে চালু রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, অর্থাৎ মেরেকেটে পাকিস্তান নিলেও মুসলমান হিসেবে ভারতবর্ষে থাকার আর কোনো সমস্যাই থাকল না তখন তারা অনেকেই ভারতে থেকে গেল। শুধু তাই নয়, অনেকে যারা প্রথমে ভয়ে পাকিস্তান চলে গেছিল তাদের মধ্যে অনেকে নেহরু-লিয়াকত চুক্তির ফলে আবার ভারতে ফিরে এল। এই ভাবে, দেশ ভাগ হলেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচুর মুসলমান জনগোষ্ঠী রয়ে গেল। এদেশে থেকে যাওয়া মুসলমানদের অনেকেই এমন আছে যারা সেকুলার ভারতে বসবাস করলেও মনে মনে ইসলামি জিহাদি মনোভাবাপন্ন। এইসব ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠীকে স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তান ব্যবহার করে ভারতবিরোধী কাজ করে চলেছে। যদিও ভারতে থাকা এই মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই

আছেন যারা প্রগতিশীল এবং সেকুলার কিন্তু তারা কট্টরপন্থী মুসলমানদের ভয়ে চুপ করে থাকেন। তাই এই কট্টরপন্থী মুসলমানেরাই ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করে। আর আমাদের দেশের মেকি সেকুলারপন্থী নেতারা নিজেদের ধান্দার জন্য এদের তোয়াজ করে চলেছে। স্বাধীনতার পর ৭০ বছর ধরে আমাদের দেশের মেকি সেকুলারপন্থী নেতা ও ভণ্ড বুদ্ধিজীবীদের মুসলমান তোষণের ফলে এইসব মুসলমান মৌলবাদী জিহাদি গোষ্ঠী এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে তারা এখন জিহাদের সাহায্যে ভারতকে আর একটি টুকরো করে মোগলস্তান গঠনের পরিকল্পনা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় সেইসব কাজকর্মের নমুনা দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের খাগড়াগড়, কালিয়াচক, দেগঙ্গা, ক্যানিং, উস্তি ইত্যাদি অঞ্চলে ইসলামিক মৌলবাদীদের তাণ্ডব সেই বার্তাই দিচ্ছে। এদের একটা পরিকল্পনা হলো সীমান্ত লাগোয়া ভারতীয় গ্রামগুলিতে দাঙ্গা হাঙ্গামা লাগিয়ে, গবাদিপশু চুরি করে, হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধা সৃষ্টি করে, মেয়েদের শ্লীলতাহানি করে হিন্দুদের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার করা যাতে তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে জমিজায়গা বেচে চলে যায় এবং ওই এলাকায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। তারপর সংখ্যাধিক্যের জোরে লোকালবডির পদগুলো দখল করে গ্রামে এবং জেলার প্রশাসনে নিজেদের শাসন কায়েম করা। এইভাবে বাংলাদেশের বর্ডার লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব গ্রামেই এখন মুসলমানদের দখলে চলে গেছে।

এদের আরেকটি পরিকল্পনা হলো ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে একেকটি অঞ্চলের ডেমোগ্রাফি পরিবর্তিত করে ফেলা। ইরানের বিশিষ্ট লেখক-বুদ্ধিজীবী আলি সিনা মৌলবাদী ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি কীভাবে সারা বিশ্বে ইসলামিক সাম্রাজ্যের জাল বিস্তার করতে চাইছে তা তিনি সবিস্তারে লিখেছেন : ''অ-ইসলামিক রাষ্ট্রগুলিতে এই ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনগুলি অনুপ্রবেশের মাধ্যমে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। অ-ইসলামিক রাষ্ট্রগুলিতে অনুপ্রবেশ করে ক্রমে সেখানে বসবাস এবং পেশাগত কাজকর্ম করতে শুরু করে। ক্রমে জনসংখ্যার একটি প্রভাবশালী অংশ যখন এরা হয়ে ওঠে, তখনই এদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পেতে থাকে। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিকভাবে অ-ইসলামিক রাষ্ট্রগুলিতে তারা তখন প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী হয়। অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর হামলা চালিয়ে, তাদের জোর করে ধর্মান্তরিত করে, নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে চায়।'' আলি সিনা আরও বলেছেন--- ''Terrorists are simply doing that and we the intellectual apologists of Islam are justifying it.''

'অনুপ্রবেশ' ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির জিহাদের একটি ভাল উপায়। আমাদের মেকি সেকুলারবাদী নেতাদের ভোট লালসার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই কাজটি তারা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে করে চলেছে। আমাদের দেশের ধান্দাবাজ রাজনৈতিক নেতারা এই অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য এদের রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট ইত্যাদি বানাতে সাহায্য করছে এবং এদেশে গেড়ে বসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সীমানা নিয়ে আমরা যতটা চিন্তিত, ২২১৭ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমানা নিয়ে ততটা চিন্তিত নই। আর এই সুযোগটাই নিচ্ছে জিহাদিরা।

ডেমোগ্রাফি পরিবর্তনের আর একটি উপায় মুসলমান পরিবারে জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে না দেয়া; এবং শরিয়ত কানুন অনুযায়ী একজন মুসলমান পুরুষের ৪টি করে বিয়ে করার অধিকার।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী উত্তরদিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে গেছে। হিন্দুদের মধ্যে একতার অভাব, তাদের উদাসীনতা, ইসলাম সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা বারবারই তাদের ইসলামের তরবারির কাছে নতজানু হতে বাধ্য করেছে। মনে রাখতে হবে, সম্রাট অশোকের সময়ে হিন্দু ভারতের সীমানা আফগানিস্তানের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্রাট অশোকের সময়কার হিন্দু ভারতবর্ষ পরবর্তীকালে ইসলামি জিহাদের ফলে টুকরো হয়ে চারটি দেশ হয়। তার মধ্যে তিনটি ইসলামিক দেশ— আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চতুর্থটি মেকি-সেকুলারদেশ ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের মেকি সেকুলারবাদী নেতারা ও মেকি বুদ্ধিজীবীরা এবার সতর্ক হোন, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন, দয়া করে বোকা কালিদাসের মতো যে ডালে বসে আছেন তার গোড়াটি কাটবেন না। তাতে আপনারা তো মরবেনই গাছের তলায় যারা আছে তারাও মরবে। জিহাদিদের হাত থেকে বাঁচতে হলে সমস্ত ভারতবাসীকে একমত হয়ে দ্রুত 'Uniform Civil Code' পাশ ও চালু করতে হবে, মুসলমানদের বহুবিবাহ প্রথা রদ করতে হবে, কাশ্মীরের বিশেষ সাংবিধানিক ৩৭০ ধারা বাতিলের জন্য দেশ জুড়ে জনমত গঠন করতে হবে। অর্থাৎ সত্যিকারের সেকুলারবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হিন্দুদের মতো মুসলমানদের মধ্যেও বাধ্যতামূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অনুপ্রবেশ কঠোর ভাবে রুখতে হবে। যারা ইতিমধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে তাদের বিতাড়িত করতে হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার, ব্যক্তি স্বাধীনতার, মানবতাবাদের অপপ্রয়োগ করে যারা দেশবিরোধী কার্যকলাপকে সহায়তা করছে, দেশের অখণ্ডতার সামনে বিপদ ডেকে আনছে তারাও দেশদ্রোহী। তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। তার জন্য কিছু আইনের সংযোজন করতে হলে তাই করতে হবে। ভারতের জনগণ এইসব করতে যদি সরকারকে চাপ না দেয় এবং সাহায্য না করে, তবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে এবং মোগলস্তান তৈরি হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলাম প্রবর্তনের পরে ১৪০০ বছরে এইভাবেই ৪টি মহাদেশে ৫৭টি ইসলামিক দেশ জিহাদের ফলে তৈরি হয়েছে। ইসলামের তলোয়ার, দুর্বল কাফেরদের গর্দানের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সাবধান হতে হবে, কেননা ভারতের শিয়রে শমন। ■

রাজনৈতিক দলগুলির আয়-ব্যয়

অভিমন্যু গুহ

রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো পরিসংখ্যান। দিল্লির সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজ (সি এম এস) জানাচ্ছে যে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে সব মিলিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির খরচের পরিমাণ ৩৫ হাজার কোটি টাকা। ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যে স্বাস্থ্য বাজেট ঘোষণা করেছে তাও ৩৩ হাজার কোটি ছাড়ায়নি। ফলে দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের হাল কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তা বোঝাই যায়। যদিও সরকারি রেকর্ড বলছে খরচ মোটেও ৩৫

হাজার কোটি নয়, সেটা বড়জোর ৭-৮ হাজার কোটি হবে। অর্থাৎ এই যে সরকারি হিসেব-বহির্ভূত ২৭-২৮ হাজার কোটি টাকা খরচ হলো তার উৎস কী কেউ জানে না। সি এম এসের সূত্রই বলছে উত্তরপ্রদেশে ভোটে লড়ার টিকিট পেতেই খরচ হয়েছে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার মতো। বিধানসভাওয়াড়ি ফলাফল তো আরও মারাত্মক। দেশের মোট ৪১২০টি বিধানসভা আসনে অন্তত ১২ হাজার কোটি কালোটাকা খেটেছে বলে সমীক্ষকদের অনুমান। গত ৮ নভেম্বর পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণা আসলে এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা। একদিকে আসন্ন উত্তরপ্রদেশ-সহ আরও কয়েকটি রাজ্যের নির্বাচনের বিষয়টি তো মাথায় ছিলই, অন্যদিকে ব্যবসায়ী-রাজনীতিক অসাধু আঁতাতটিকেও এর মাধ্যমে ভাঙতে চেয়েছিলেন তিনি।

রাজনীতির এই জবরদস্ত অর্থনীতিতে সাধারণ অর্থনীতি রীতিমতো বিপন্ন বোধ করে। কারণ একদিকে এই বিষয়টি যেমন সাধারণ অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে, অন্যদিকে এই অর্থনীতিতে সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীদের বিন্দুমাত্র লাভ হয় না। কেবল কিছু রাজনৈতিক নেতা ফুলে-ফেঁপে ওঠেন। যাদের সাধারণভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ২০১৪ সালে ১৬৫ জন পুনর্নির্বাচিত সাংসদ গত পাঁচ বছরের হিসেবে তাঁদের সম্পত্তি বৃদ্ধির পরিমাণ ১৩৭ শতাংশ দেখিয়েছেন। তাও এটি সরকারি হিসেব। বেনামী সম্পত্তি কোথায় কী লুকানো রয়েছে সেটা মোদী সরকারের এনিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে। আয়কর আইনের ১৩এ ধারা অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলির আয় একশো শতাংশ আয়কর-মুক্ত। এরই সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী রাজনীতিকে তাদের আয়ের উৎস ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র বানিয়েছে। এডি আর-এর রিপোর্ট বলছে ২০০৫ সাল থেকে ২০১৩, এই ক'বছরে ছ'টি জাতীয় দল— কংগ্রেস, বিজেপি, বহুজন সমাজ পার্টি, এনসিপি, সিপিআই এবং সিপিএম আয় করেছে ৫৯৮৬ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। যদিও এই বিপুল আয়ের ৭৩ শতাংশের উৎসই অজানা। এর মধ্যে সবচেয়ে মজার ব্যাপার ঘটেছে মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টির ক্ষেত্রে। এদের আয়ের উৎসের একশো শতাংশই অজানা। দাবি এদের সমস্ত অর্থদাতাই নাকি ২০,০০০ টাকার কম অর্থদান করেছে। ফলে তাদের আর নাম-ধাম লিখে রাখা হয়নি। অথচ ২০১৩-১৫ সালের মধ্যে বিএসপি-র আর্থিক আয় বেড়েছে ৬৭.৩১ শতাংশ, যা যে-কোনো সর্বভারতীয় দলের চেয়ে বহুগুণ বেশি।

কংগ্রেসের ক্ষেত্রে বিষয়টি তো আরও মজাদার। ২০ হাজারের বেশি অর্থদাতাদেরও নাম-ধাম থাকে না নেতৃত্বের কাছে। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে ১৯২ জন অর্থদাতা ১৩৮.৯৮ কোটি টাকা ঢেলেছেন কংগ্রেসের তহবিলে। কিন্তু তাদের চেক নম্বর কিংবা ডিমান্ড ড্রাফট নম্বর সবকিছুতেই পার্টির গোপনীয়তা। নির্বাচন কমিশনের হাতে এই স্বাধীনতা আছে যে-কোনো দলের তহবিলে আসা টাকার উৎস তারা খতিয়ে

দেখতে পারবে। কিন্তু গরমিল ধরা পড়লে সেই দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের ক্ষমতা তাদের নেই। নির্বাচন কমিশনের নিয়মানুযায়ী ৫৩৩টি বড়ো লোকসভা কেন্দ্রে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৭০ লক্ষ টকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারেন। বাকি দশটি ছোটো কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ ৫৪ লক্ষ টাকা। কংগ্রেসেরই একটি সূত্রের খবর, শহুরে লোকসভা নির্বাচনগুলিতে তাদের প্রার্থীপিছু খরচ গড়ে দশ কোটি টাকা আর গ্রামীণ লোকসভা নির্বাচনকেন্দ্রগুলিতে ৫ কোটি টাকা। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী কোনো প্রার্থী নির্দিষ্ট ব্যয়সীমার বেশি খরচ করলে, জিতলেও তাঁর প্রার্থীপদ বাতিল হতে পারে। পরবর্তী ছ' বছর আর কোনো নির্বাচনে না দাঁড়ানোর শাস্তিও হতে পারে।

শাস্তি এড়াতে গিয়ে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে একটা অদ্ভুত বিষয় দেখা গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট ব্যয়সীমার মাত্র ৫৮ শতাংশ খরচ দেখিয়েছে কোনো কোনো দল। আবার আরেকটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে নির্বাচন-কেন্দ্র পিছু গড়ে প্রার্থীদের খরচ নাকি মাত্র ২৫ লক্ষ টাকা! অথচ প্রায় সবদলেরই অভিযোগ যে নির্বাচনী কেন্দ্র প্রতি ব্যয়বরাদ্দ ৭০ লক্ষ টাকা খুবই কম। সুতরাং আইন আছে, আর আইনের ফাঁক বুঝে তাকে ফাঁকি দেওয়ার পন্থাও অনেকের জানা। কিন্তু এদের সামনে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে মোদী সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত। আচমকা এই ঘোষণায় দিশেহারা দেখিয়েছে উত্তরপ্রদেশের বহু আঞ্চলিক দলকেই। জনধন যোজনা ইত্যাদি এদিক-ওদিক কালোটাকাকে সাদা করার চেষ্টা থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্যই। যে কারণে উত্তরপ্রদেশের একাধিক নদী থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক বস্তাবোঝাই পুরনো পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট। তার থেকেও বড়ো কথা উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি এবং অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করেছে জালনোট। মোদীর নোট বাতিলের চালে একদিকে যেমন নকশালি অর্থনীতিতে ধস নেমেছে অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে তাদের জাল নোট পাচারের কারবারও শেষ হয়ে গেছে।

এবার দেখা দরকার যে রাজনৈতিক দলগুলির আয়ের উৎস কোথায়? তাদের এক এবং একমাত্র আয়ের জায়গা অনুদান বা চাঁদা।

সারণি-১

কালোটাকার খেল—লোকসভা নির্বাচন-২০১৪

- লোকসভা নির্বাচনে খরচ হয়েছে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারিভাবে খরচ ৮ হাজার কোটি টাকা। বাকি ২৭ হাজার কোটির কোনো হিসাব নেই।
- ২০০টি শহরে লোকসভা কেন্দ্রে গড়ে খরচ পড়ে ১০ কোটি টাকা।
- ৩৪৩টি গ্রামীণ লোকসভা কেন্দ্রে গড়ে খরচ পড়ে ৫ কোটি টাকা।
- সব মিলিয়ে দেশের ৫৪৩টি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার চালাতে প্রার্থী পিছু গড়ে খরচ পড়েছে ৭ কোটি টাকা।
- মোটামুটি ভাবে প্রতি কেন্দ্রে চার জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে খরচের ধাক্কা স্রেফ একটা লোকসভা কেন্দ্রের জন্যই ২৮ কোটি টাকা।
- নির্বাচন কমিশনের নিয়মানুযায়ী দেশের ৫৩৩টি বৃহৎ লোকসভা কেন্দ্রে প্রতি প্রার্থী সর্বোচ্চ খরচ করতে পারেন ৭০ লক্ষ টাকা এবং বাকি দশটি অপেক্ষাকৃত ছোটো লোকসভা কেন্দ্রে এই সর্বোচ্চ খরচের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা। অথচ বিপুল টাকা ওড়ানোর পরও প্রার্থীরা দেখাচ্ছে যে বরাদ্দের ৫৮ শতাংশ বা কোনো ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ টাকার বেশি তাঁরা খরচ করেননি।
- অর্থাৎ একটি কেন্দ্রে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে কেন্দ্র পিছু খরচ দেখানো যাচ্ছে মাত্র ১ কোটি টাকা।
- সুতরাং গড়ে প্রতিটি কেন্দ্রে ২৭ কোটি কালো টাকা খেটেছে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে।
- ৫৪৩টি আসনে কালোটাকা খাটার পরিমাণ ১৪,৬৬১ কোটি টাকা।

সূত্র : সি এম এস, দিল্লি

সারণি-২

কালোটাকার খেল—বিধানসভা নির্বাচনে

- দেশে বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যা ৪১২০।
- প্রতিটি কেন্দ্রে একজন প্রার্থী গড়ে খরচ করেন ১ কোটি টাকা।
- একজন প্রার্থী নির্বাচন কমিশনের নিয়মানুযায়ী সর্বোচ্চ খরচ করতে পারেন ২৮ লক্ষ টাকা।
- একটি কেন্দ্রে প্রার্থীর সংখ্যা চারজন হলে কেন্দ্রপিছু নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য খরচ কমপক্ষে ৪ কোটি টাকা।
- একটি কেন্দ্রে চার প্রার্থী খরচ করতে পারেন নির্বাচন কমিশনের নিয়মানুযায়ী ১.১২ কোটি টাকা।
- সুতরাং ৪১২০টি বিধানসভায় বিধানসভা পিছু ৪ কোটি নির্বাচনী খরচ ধরলে মোট হিসাব গিয়ে দাঁড়ায় ১৬৪৮০ কোটি টাকা।
- নির্বাচন কমিশনের বিধি মেনে খরচ দেখানো যাবে বড়জোর ৪৬১৪.৪ কোটি টাকা।
- ফলে দেশের বিধানসভা নির্বাচনে খাটা কালোটাকার পরিমাণ ১১,৮৮৬ কোটি টাকা।

সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কৌটো নেড়ে বা টিকিট অথবা কুপন বিলিয়ে যেটুকু টাকা মেলে তা নিয়ে বিশেষ সমস্যা নেই। কিন্তু গোলমালের জায়গা হয়েছে অনুদান ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে 'ডোনেশন'। কর্পোরেট সংস্থা বা বড়ো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান একপ্রকার যাকে অর্থনীতিক পরিভাষায় বলে বিনিয়োগ, রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদানের মাধ্যমে আসলে বিনিয়োগ করে তারা। এই বিনিয়োগের বিনিময়ে পার্টি ক্ষমতায় থাকুক আর নাই থাকুক, নানান অন্যায্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করে কর্পোরেট সংস্থা বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি। এরই পাশাপাশি কালোটাকা অর্থাৎ সরকারকে কর না দেওয়া অর্থকে সাদা করার জন্যও রাজনৈতিক দলগুলিকে বিপুল পরিমাণ অর্থ অনুদান দিয়ে থাকে এরা এবং বলাই বাহুল্য এগুলি সবই ক্যাশে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ক্যাশলেস অর্থনীতি যে এইসব দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক দলগুলিকে সবচেয়ে বেশি আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত করবে সেটা বুঝেই এরা আন্দোলনের ধুয়ো তুলেছে।

এতো গেল রাজনৈতিক দলের আয়। এর মধ্যে দলের নেতাদের হিস্সা অবশ্যই থাকে। কিন্তু নেতাদের আয়ের বড়ো উৎস তোলাবাজি। আর এই তোলাবাজির টাকা অবশ্যই ক্যাশে অর্থাৎ নগদ অর্থে। মোদীর নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে যারা গলা ফাটাচ্ছে এই বলে যে কালো টাকা লোকে ঘরে রাখে না, তাদের জানা উচিত তোলাবাজির টাকা রাজনৈতিক নেতারা বিশেষ বিনিয়োগ করেন না। সরকারে থাকাকালীন এদের আর্থিক দুর্নীতিগুলি বরং বিনিয়োগরূপে দেখা দেয়। কংগ্রেস, কমিউনিস্টরাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তোলাবাজির টাকা নেতাদের সিন্দুকেই থাকে। মায়াবতী, লালু, মুলায়মের দলই তার উদাহরণ। মোদীজীর নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত তাই সুড়সুড় করে এই সিন্দুক ভর্তি অচল টাকা এক ঝটকায় বাইরে এনে ফেলেছে। এর-তার ব্যাঙ্কে আর কত বিনিয়োগই বা করা যায়। তার ওপর আয়করের নজরদারিতেও এইসব কালোটাকার কারবারিদের ঘুম ছুটে যাওয়ার জোগাড়।

এডি আর-এর রিপোর্টে রাজনৈতিক দল আর তাদের নেতাদের দেনা-পাওনাতেও বিস্তর অসামঞ্জস্য ও গরমিল ধরা পড়েছে। যেমন ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ৬টি সর্বভারতীয় দলের ২৭৭ জন সাংসদের মধ্যে মাত্র ৭৫ জন ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা পার্টির কাছ থেকে মোট ৭.৪৬ কোটি টাকা পেয়েছেন। যদিও পার্টির হিসাবে ১৩৮ জন সাংসদকে তারা দিয়েছে ১৪.১৯ কোটি টাকা। একইভাবে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে জাতীয় দলের ৩৪২ জন সাংসদের মধ্যে ২৬৩ জন সাংসদ জানিয়েছেন যে তাঁরা পার্টির কাছ থেকে পেয়েছেন মোট ৭৫.৬৯ কোটি টাকা। কিন্তু পার্টির দাবি ১৭৫ জন সাংসদকে দলের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে মোট ৫৫.২৩ কোটি টাকা। এসব ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় দলগুলির মধ্যে যেটুকুও বা স্বচ্ছতা আছে, আঞ্চলিক দলগুলিতে তো পুরোটাই অস্বচ্ছ। সর্বভারতীয় দল বলতে এখানে খাঁটি সর্বভারতীয় দলই বোঝানো হচ্ছে। মায়াবতী বা মমতার মতো নামে সর্বভারতীয়, কাজে আঞ্চলিক দলের কথা হচ্ছে না। এডি আর-এর একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কংগ্রেসের মতো জাতীয় দলের আয়ের থেকে ব্যয় বেশি। অন্যদিকে এনসিপি, বিএসপি, সিপিআই, সিপিএমের মতো জাতীয় দলের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা ঘটেছে। অর্থাৎ এদের ব্যয়ের তুলনায় আয় বেশি (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)। আবার ২০০৪ থেকে ২০১৫ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিধানসভা নির্বাচনের খতিয়ানে দেখা যাচ্ছে আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে সমাজবাদী পার্টি,

সারণি-৩

লোকসভা নির্বাচন-২০১৪
জাতীয় দলের আয়-ব্যয়*

জাতীয় দল	আয়	ব্যয়
বিজেপি	৫৮৮.৫	৭১২.৫
কংগ্রেস	৩৫০.৪	৪৮৬.২
এন সি পি	৭৭.৯	৬৪.৫
বি এস পি	৭৭.৩	৩০.১
সি পি আই	৫৫.১	৮.৮
সি পি এম	৯.৫	৬.৭
* হিসাব কোটি টাকাতে		*সূত্র : এ ডি আর*

সারণি-৪

বিধানসভা নির্বাচন-২০১৪-২০১৫
আঞ্চলিক দলের আয়-ব্যয়*

আঞ্চলিক দল	আয়	ব্যয়
সমাজবাদী পার্টি	১৮৬.৮	৯৬.৬
আম আদমি পার্টি	৩৮.৫	২২.৯
শিবসেনা	৩১.৭	২৯.৬
এস এ ডি	২১.৭	২৪.১
তৃণমূল	১২.৩	১৮.৮
* হিসাব কোটি টাকাতে		

আপ কিংবা শিবসেনার আয়ের থেকে ব্যয় কম। অন্যদিকে এস এ ডি, তৃণমূলের আয়ের থেকে ব্যয় কিছু বেশি (সারণি-৪ দ্রষ্টব্য)। এখন প্রশ্ন, এই উদ্বৃত্ত টাকা যাচ্ছে কোথায়? নেতা-নেত্রীদের পকেটে গেলে মনে রাখতে হবে তা কিন্তু আর করহীন থাকছে না। কারণ রাজনৈতিক দলের জন্য অনুদান ব্যক্তিগত আয়ে রূপান্তরিত হতে পারে না। সুতরাং এভাবেও কালোটাকার খনি সৃষ্টি করা যায়।

স্বাভাবিকভাবেই অনেক ক্ষেত্রেই দলের থেকে ব্যক্তি বড়ো হয়ে যাচ্ছে। ২০০৪, ২০০৯, ২০১৪— এই তিন লোকসভা নির্বাচনে এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে আর্থিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে সাংসদদের জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা বিবেচিত হয়। যেমন আর্থিকভাবে কমজোরি সাংসদদের জয়ের সম্ভাবনা যদি ১ শতাংশ থাকে, তবে ধনীদের জয়ের সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে হয় ২৩ শতাংশ। গড়ে জয়ী প্রার্থীর সম্পত্তি কম করেও ৩ কোটি টাকা। তার থেকেও মজার ব্যাপার যে, জয়ী প্রাথীদের ক্ষেত্রে অন্তত গড়ে ৪.২ কোটি টাকা আর্থিক তছরূপের অভিযোগ রয়েছে। ২০০৪ থেকে ২০১৪— এই দশ বছরে তিনটি লোকসভা নির্বাচনে জয়ী সাংসদদের বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগও ক্রমবর্ধমান।

এখন প্রশ্ন, এর থেকে মুক্তি মিলবে কীভাবে? রাজনীতিকরা দুর্নীতিপরায়ণ হলে দেশের সমূহ বিপদ। এবং দেশ এখনও সেই বিপদের মুখেই। এই অবস্থায় সদিচ্ছার প্রয়োজন দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের। কিন্তু সেই সদিচ্ছা যে তাদের নেই নরেন্দ্র মোদীর নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘিরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। স্বাধীনোত্তর সত্তর বছরে ভারত তো কম রাজনৈতিক লুটেরা দেখেনি আর স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গও চৌত্রিশ প্লাস ছয় ডাকাতদের দেখছে। চৌত্রিশে দেখেছিল 'কৌটো নাড়ানো পয়সায়' বিশাল বিশাল ইমারত গড়ে তোলা; সর্বহারার রাজত্বে সাধারণ মানুষ ভিটে মাটি সবই হারিয়েছিল বটে! আর পরের ছ'বছরে তো বাঙালির প্রকৃত ঠগি আর লুটেরা দেখার 'সৌভাগ্য' হলো। সুতরাং জনসাধারণের 'চৈতন্যোদয়'-এর ওপর ভরসা করেই একের পর এক দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে। ■

সব দলেরই কোষাগারে বেনামি উৎসের টাকার পাহাড়

২০১৪-১৫ সালে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো যত টাকা অনুদান বাবদ উপার্জন করেছে তার ৬০ শতাংশই এসেছে নাম-না-জানা নানান উৎস থেকে। নগদে পাওয়া এই বিপুল অর্থের উৎস সম্পর্কিত কোনো তথ্য আয়কর দপ্তরের কাছেও নেই।

সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় জানা গেছে ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছেই বিশাল অঙ্কের টাকা রয়েছে। উত্তরপ্রদেশের শাসকদল সমাজবাদী পার্টির কাছে রয়েছে ৫৮৩ কোটি টাকা। সপার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বহুজন সমাজ পার্টির ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ৫১৪ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বহুজন সমাজ পার্টি এমন একটি দল যাদের অনুদান বাবদ পাওয়া অর্থের সবটাই এসেছে অজ্ঞাত উৎস থেকে। দলের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন যাবতীয় অনুদান ২০,০০০ টাকা বা তার নীচে হওয়ার কারণে কোথাও নথিভুক্ত করা হয়নি। ভারতের দুই জাতীয় দল বিজেপির ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ৬৫৩ কোটি টাকা আর কংগ্রেসের ৬০১ কোটি টাকা। অন্যদিকে সিপিএমের সংগৃহীত অনুদানের পরিমাণ ২৮৬ কোটি টাকা। সমীক্ষায় একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। ২০১৬-য় অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে বিধানসভা নির্বাচনে খরচ করার জন্য সিপিএম মোট ৬০ কোটি টাকা অনুদান নিয়েছে। যার ৫৮ শতাংশ অর্থাৎ ৩৪ কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে নগদে কিন্তু ৬৮ শতাংশেরও বেশি অর্থাৎ প্রায় ৩২ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে চেকের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ৭২ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী ভারতে পঞ্জীকৃত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ১৮০০। কিন্তু এর মধ্যে প্রায় ৪০০ টি দল নির্বাচনে কখনও অংশগ্রহণ করে না। কমিশনের অভিযোগ, যেহেতু রাজনৈতিক অনুদান সম্পূর্ণ করমুক্ত, এই দলগুলি নির্বাচনে না লড়েও এই সুযোগ অন্যায় ভাবে ভোগ করে। শুধু তাই নয়, এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী তাদের পাহাড়প্রমাণ কালো টাকা এই দলগুলির মাধ্যমে সাদা করে নেয়। ২২১টি এরকম দলকে ইতিমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে। নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক দলগুলির তহবিলে স্বচ্ছতা আনার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। সকলেই অপেক্ষা করছেন আরও ভালো কিছুর আশায়।

কোন দলের কাছে কত টাকা		
বিজেপি	—	৬৫৩*
কংগ্রেস	—	৬০১
সিপিএম	—	২৮৬
তৃণমূল কংগ্রেস	—	৭২
সমাজবাদী পার্টি	—	৫৮৩
বহুজন সমাজ পার্টি	—	৫১৪

(*কোটি টাকায়)

(৩১ মার্চ ২০১৬ অবধি আর্থিক মূল্যায়ন অনুযায়ী)

সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া, নির্বাচন কমিশন এবং এ ডি আর।

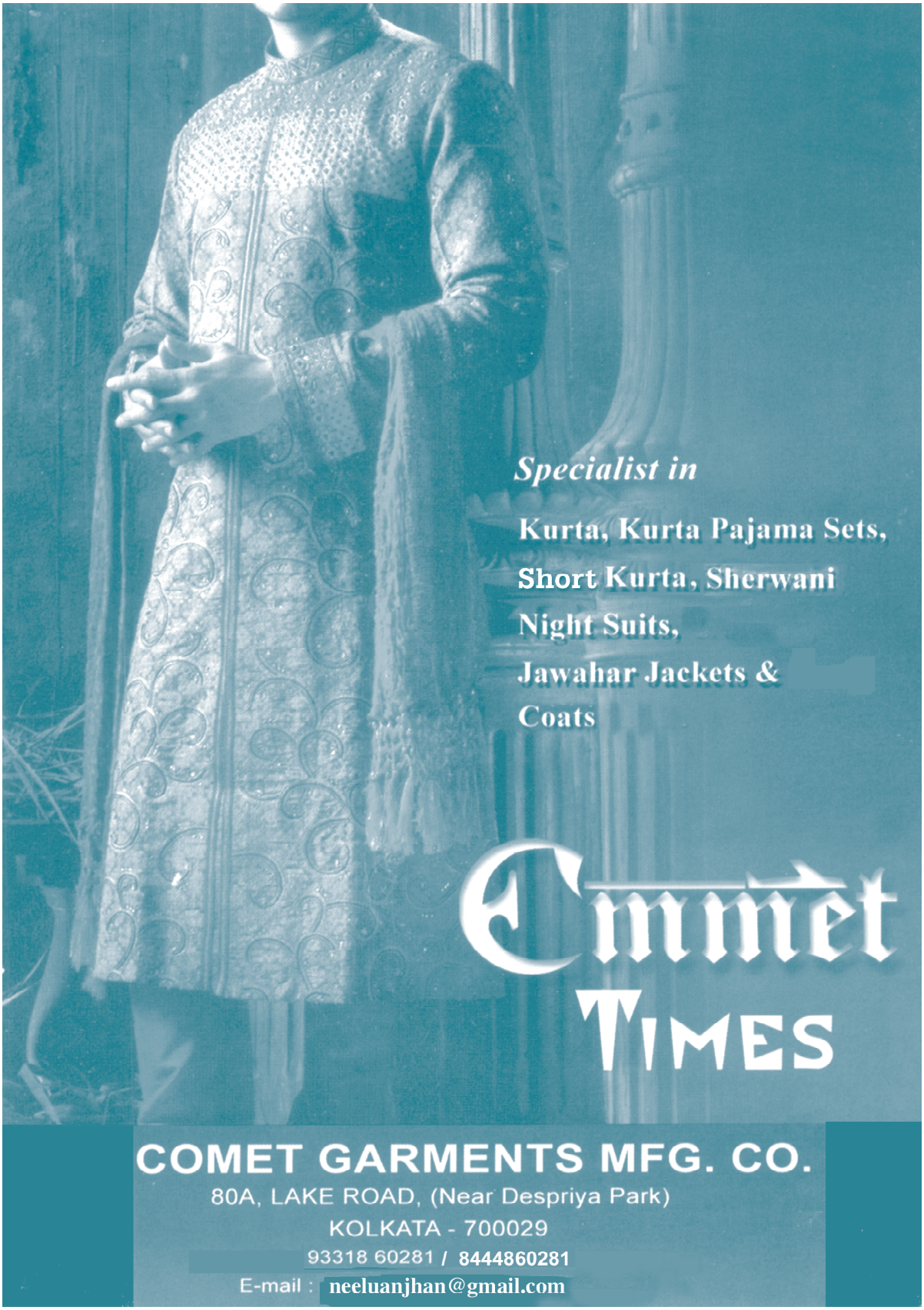
Specialist in
Kurta, Kurta Pajama Sets,
Short Kurta, Sherwani
Night Suits,
Jawahar Jackets &
Coats
Comet
TIMES
COMET GARMENTS MFG. CO.
80A, LAKE ROAD, (Near Despriya Park)
KOLKATA - 700029
93318 60281 / 8444860281
E-mail : neeluanjhan@gmail.com

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা

সম্প্রতি কয়েকটি বাংলা দৈনিক বাংলাদেশ তথা অবিভক্ত ভারতের বিচ্ছিন্ন অংশ থেকে আগত সংখ্যালঘুদের ভারতে নাগরিকত্ব প্রদানের সিদ্ধান্তের বাস্তবতা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে। ওই সমস্ত দেশ থেকে আগত হিন্দুদের তথা অন্য সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব প্রদানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে পাকিস্তানের আহমদিয়া মুসলমান এবং মায়ানমার হতে আগত (বাংলাদেশ প্রত্যাখ্যাত) রহিঙ্গা মুসলমানদের তুলনা করেছেন যা ঐতিহাসিক অজ্ঞতার নামান্তর। সম্ভবত শরণার্থী আর উদ্বাস্তু (Evacuee and Refugee) শব্দ দুটির পার্থক্য বুঝতে অসমর্থ হওয়ায় এই বিপত্তি। ধর্মীয় ও জাতিগত কারণে নির্যাতিত বক্তিদেরই— যাঁরা নিরাপত্তার কারণে নিজ ভূমে ফেরত যেতে চায় না তাদেরই কেবল রাষ্ট্র সঙ্ঘের সনদ অনুযায়ী (United Nations High Commission for Refugees) উদ্বাস্তু বলা হয়। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ওই সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনে জাতিসঙ্ঘের সাহায্যে চাইতে পারে। আর যাঁরা সাময়িক রাষ্ট্র বিপ্লবের কারণে বা জাতিদাঙ্গার জন্য অন্যত্র আশ্রয় প্রার্থীদের (Evacuees) শরণার্থী বলা হয়— যা ঘটেছিল ১৯৭১-এ এবং বর্তমানে দাঙ্গাকবলিত মুসলিম দেশগুলিতে ঘটছে। এই আশ্রয় প্রার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের প্রশ্ন নেই— স্বাভাবিক অবস্থা ফিরলে তারা নিজ নিজ দেশে ফিরবেন— এটাই স্বাভাবিক, ব্যতিক্রম ঘটাতে চাইলে সেই দেশের সরকারই সিদ্ধান্ত নেবেন। সুতরাং এই দুই ধরনের মানুষের সমস্যা এক করে দেখার প্রবণতার পিছনে হয় অজ্ঞতা বা বিদ্বেষ কাজ করে। ভারতের জাতীয় নেতারা স্বাধীনতার ঊষা লগ্নেই, ধর্মীয় বিভাজনের কারণে পাকিস্তানভুক্ত অংশের সংখ্যালঘুদের ভারতের মুক্তি আন্দোলনে অবদানের কথা মাথায় রেখে— তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসলামিক পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তথা মানবিক কারণে ধর্মীয় বৈষ্যমের শিকার দেশত্যাগীদের আশ্রয় এবং নাগরিকত্ব প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নরেন্দ্র মোদী সরকার সেই প্রতিশ্রুতি পালনে অগ্রসর হয়েছেন।

—**কে. এন. মণ্ডল,**
ঘোষালপাড়া, সোনারপুর, কলকাতা-১৫০।

কাঁথি পৌরসভার প্রতি

আমি ১৫ নম্বর ওয়ার্ড, আঠিলাগড়ী, কাঁথি পৌরসভার বাসিন্দা। আমি ২০০২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তরণের সুবাদে কাঁথি পৌরসভা কর্তৃক একটি রজতপদক ও মানপত্র দ্বারা পুরস্কৃত হই। সেই অনুষ্ঠানে মাননীয় শিশির অধিকারী (তৎকালীন পৌরপ্রধান) আমাদের প্রত্যেককে পুরস্কার তুলে দেওয়ার সময় আশীর্বাদ করেছিলেন— 'বড় হও, মানুষ হও' এই বলে।

অন্যায় ঘটতে দেখলে তার প্রতিবাদ করা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের একান্ত কর্তব্য। শিক্ষাগুরুদের আমার প্রণাম, তাঁরা সচেষ্ট হয়ে এই ভাবনায় দীক্ষিত করেছেন আমায়। আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বিষয়সংক্রান্ত কিছু সমস্যায় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে আসছি।

চিঠিপত্র

আমাদের বাড়ির একটি গলিপথে জোরপূর্বক ব্রহ্মতলা মন্দিরের ওপরতলায় যাবার সিঁড়ি বসানো হয়েছে, আর একটি গলিপথের পাশেই আইনবিরুদ্ধ ভাবে পাশের জমির বর্তমান মালিক বাড়ি তৈরি করছেন। খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এই সমস্ত বিষয়ে পৌরসভা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে থেকেও প্রশাসন আমাদের পীড়ালাঘব করতে ব্যর্থ হয়েছে ও অসাধুভাবে প্রশাসনকেই ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদের ওপর। ড. আম্বেদকর সংবিধানের কার্যকরী ফল সম্পর্কে বলেছিলেন, সংবিধান অধিকার দেয়, কিন্তু তা বাস্তবায়িত করতে দরকার সদিচ্ছাপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার। আমি অতীব ভীত যে, সদিচ্ছাপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছে ও প্রশাসনকে কিছু অসাধু মানুষ নিজেদের ইচ্ছেমত প্রবাহে চালিত করছেন। এমতাবস্থায় কাঁথি পৌরসভা প্রদত্ত পদকটির সম্মান রক্ষিত হচ্ছে না। কারণ, শিক্ষার উদ্দেশ্য চেতনার উন্মেষ। চেতনার উন্মেষের যথাযথ সুযোগ ছাড়া এই পদকটি সামান্য মূল্যবান ধাতুখণ্ড ব্যতীত আর কিছু নয়। আমি সুস্থ মস্তিষ্কে, বিনা প্ররোচনায় এই পদক ও তৎসহ মানপত্রটি পৌরসভার দপ্তরে ফিরিয়ে দিলাম। আমি আশা করব, আপনি আদর্শ প্রশাসক রূপে আপনার চালিত প্রশাসনের অপব্যবহার আটকাতে সচেষ্ট হবেন। এই পদক ত্যাগ করার মাধ্যমে কাউকে অসম্মান করছি না। আমার শিক্ষা আমার অন্তরে প্রোথিত। ঈশ্বরের নিকট আমি আপনার দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।

—**শ্রী কৌশিক পাল,** কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর।

ব্যক্তি ও দল

দুর্নীতিবাজ, কালোটাকার কারবারি এবং জঙ্গি সংগঠনগুলির আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য নরেন্দ্র মোদী। ঘরে বাইরে তাঁর শত্রু। কারণ দুর্নীতিবাজ, কালোটাকার কারবারি এবং জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি তাঁর বিরোধী দলে যেমন আছে, তেমনি সরকারি দপ্তরেও কিছু অসৎ ব্যক্তি আছে। তাই লড়াই তাঁর একার। একাজে সফল হওয়ার সম্ভাবনা যেমন আছে, তেমনি বিফল হওয়ার সম্ভাবনা কম নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মী দুর্নীতিতে ধরা পড়াতে তা বোঝা যায়। লড়াইটা বড় কঠিন। দুর্নীতিবাজ, কালোটাকার কারবারি এবং জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির সংখ্যা কম। কিন্তু সমাজে তাদের প্রভাব বড় বেশি। আবার দেশভক্ত জনতার সংখ্যাও প্রচুর। দেশবিরোধী কাজকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত অনেকে। তাই যাঁরা মোদীর ভারত উদ্ধার অভিযানে অংশ নিতে চান তাঁদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। মনে রাখতে হবে, মোদীজী এবার ব্যর্থ হলে আগামী হাজার বছরে ওই প্রচেষ্টা কেউ হাতে নেবে না। আর আতঙ্কে কুঁকড়ে যাওয়া, রাতের ঘুম চলে যাওয়া দুর্নীতিবাজ, কালোটাকার কারবারি এবং জঙ্গি সংগঠনগুলি পূর্ণশক্তি ও গতিতে ভারত ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হবে। তাই, মোদীজীর হাত যাতে শক্ত হয় সেই চেষ্টা করে যেতে হবে। অশুভশক্তির প্রলোভন, ভয় বা মিথ্যা প্রচারের

কাছে নতি স্বীকার করা যাবে না। নরেন্দ্র মোদীকে বিজেপি নেতা ভাববেন না। উনি ভারতের বিকাশের অগ্রদূত। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের নেতা। গণতন্ত্রের নিয়মে রাজনৈতিক দলে নাম লেখাতে হয়। মনে আছে তো নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এর কথা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দলের কি হাল! দল আর মানুষ এক নয়।

—**বরুণ মণ্ডল,**
তিলডাঙ্গা, ন'পাড়া, রানাঘাট, নদিয়া।

নোট বাতিলে হীরক সুযোগ

গত ৮ নভেম্বর ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকার নোট বাতিলের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় আপামর ভারতবাসী প্রায় সবাই খুশি। কেবল মুষ্টিমেয় কিছু কালোটাকার মালিক যারা সরকারকে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে নগদ টাকার পাহাড় করে রেখেছেন, তারাই চিল-চীৎকার করতে শুরু করছেন। মূলত মিডিয়া বিষয়টাকে আরও একটু ফুলিয়ে-ফাপিয়ে বড় করে দেখাচ্ছে। কিছু লোকের যে এই ঘটনায় অসুবিধা হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লাভ যে অনেকেরই হলো না তা কি করে বলা যায়? লাভ তো হলোই। প্রথমত, পকেটমারিং স্ত্রীর গচ্ছিত গুচ্ছ গুচ্ছ পুরানো নোটে টাকা তো বেরিয়ে এল একঝটকায়।

দ্বিতীয়ত, রাঘববোয়াল ডাক্তার কিংবা ঘুষখোর আমলা প্রকৌশলী কিংবা সুদখোর মহাজনরা তো একটু হলেও ফ্যাসাদে পড়ল। সেইসঙ্গে বড় মাঝারি ব্যবসায়ীদেরও তো একটু টনক নড়ল।

তৃতীয়ত, জাল টাকার কারবারিদের কটাদিনের জন্যে হলেও তো মাথায় হাত পড়ল।

চতুর্থত, বেকার যুবক যুবতীরা যারা কটা দিনের জন্য হলেও কালোটাকা সাদা করার ধান্দা করে কিছু টাকা তো কামাতে পারল।

পঞ্চমত, অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা তো কালোটাকায় আগাম ছ'মাস এক বছরের বেতনটা তো পেল।

ষষ্ঠত, অনেকে বলছে ব্যবসা নাকি মার খেয়েছে। কালোটাকা সাদা করার জন্যে অনেক খুচরো ব্যবসায়ী ব্যবসাটা ভালই করে নিয়েছেন। '৫০০ টাকার নোট অবশ্যই ভাঙিয়ে দেব— কমপক্ষে তিনশত টাকার মাল কিনতে হবে।' ফর্মূলাটা আকালে ব্যবসার ভালই টোটকা হয়েছে অনেকের কাছে। কালোটাকা সাদা করতে অনেকেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক জিনিস কিনেছেন।

সপ্তমত, জমা টাকার সুদ বেড়েছে। পাওনাদারদের যদিও মাথায় হাত। তবু হাড়কিপটেদের কাছে এটা একটা অজুহাত তো হয়েছে। 'দ্যাখ দেব কি করে— বুঝতেই তো পারছ। দেশের কি অবস্থা!'

অষ্টমত, চোরাচালান বন্ধ হয়েছে। অন্তত কিছুদিনের জন্যে হলেও। সেই সঙ্গে গোরু চুরিও কমেছে। গোরুর হাটই তো বন্ধ এ কটাদিন।

নবমত, দাদাদিদিদের কেরামতি বেড়েছে। কারণ মোদীজীকে গালাগাল করার গরমাগরম ইস্যু অতসহজে কি হাতছাড়া করা যায়। একটু নেচে কুঁদে হাত পা নেড়ে রাজনীতিকদের কদিন ভালই তো কাটছে।

দশমত, টাকা জমার হিড়িক দেখে ব্যাঙ্কগুলি বলছে অল্প সুদে ঋণ দেবে। ঋণগ্রহীতাদের এটা কি কম পাওনা।

একাদশত, স্বয়ং মোদী বলছেন, এর পরেও আরও কিছু আছে। বলছেন যখন তখন কিছু তো আছেই। সুক্ত দিয়ে শুরু হলেও শেষে মিষ্টান্ন কিন্তু রাখেনই গৃহকর্তা।

—**বারিদবরণ বিশ্বাস,**
বড়জোড়া, বাঁকুড়া।

নোট বাতিলে যাদের অসুবিধা

আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দাবি তুলেছেন— নোট বতিলের ঘোষণা তুলে নিতে হবে। তাঁর দাবি দু'একটি তুলে ধরলাম। 'মানুষ কাঁদছে, মোদী হাসছে, এর শেষ দেখে ছাড়ব। তিনদিন সময় দিলাম কেন্দ্রকে, সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন। মোদী সরকার ব্যাধি সরকারে পরিণত হয়েছে। এটা মিথ্যার সরকার। এটি একটি জনবিরোধী সরকার। কালো সরকারের কালো নীতি। এই 'ড্রাকোনিয়ন' সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। দেশের মানুষ এদের কাছে সেভ নয়। টাকা বদলালেই আঙুলে কালি, ওই কালি ওদের মুখে পড়বে' ইত্যাদি।

'দেশের মানুষ এদের কাছে সেভ নয়'— এই প্রসঙ্গ তুলে আমার কাছে এক ভদ্রলোক জানতে চাইলেন— 'বলুনতো পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু এবং পুলিশবাহিনী কী এরাজ্যে সেভ? যে রাজ্য সরকার ক্যানিং, নদীয়া, বীরভূম, কালিয়াচক, চোপড়া, চাঁচলের মতো জায়গার হিন্দুদের সেভ করতে পারে না, দুষ্কৃতীদের শাস্তি দিতে পারে না, দুষ্কৃতিদের মারের ভয়ে পুলিশকে টেবিলের নীচে লুকোতে হয় সেই রাজ্যের প্রধানের মুখে বড় বড় কথা?' আমি তাঁকে সবিনয়ে বললাম— 'নিজের মনকে প্রশ্ন করুন, উত্তর পাবেন।'

প্রধানমন্ত্রী ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণার পর মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা তুলতে বা বদলাতে কষ্ট পেতে হচ্ছে এটা যেমন ঠিক তেমনি তাঁরা হাসিমুখেই এ কষ্ট স্বীকার করে নিচ্ছেন দেশের স্বার্থে এটাও ঠিক। কেউ কেউ তো সাংবাদিকদের সামনে বলেই দিচ্ছেন যে, দেশের যদি ভাল হয় তাতে আমার একটু কষ্ট স্বীকার করতে ক্ষতি কী? এবার তাহলে দেখা যাক অসুবিধা কার হচ্ছে? অসুবিধা তাদেরই হচ্ছে, যাদের কাছে গোছা গোছা কালো টাকা জমানো আছে তাদের। খবরে জানা যাচ্ছে ইতিমধ্যে ওই নোট বাতিলের পরদিন থেকে কাশ্মীরে সেনাদের উপর পাথর ছোড়া খুব কমে গেছে, সীমান্তে জঙ্গি অনুপ্রবেশ কমে গেছে, পাকিস্তানে তৈরি ভারতীয় জাল টাকার মালিকরা, তাদের সন্ত্রাসীরা, বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় ভারতীয় জালটাকার গোডাউনের মালিক এবং টাকার কারবারিরা, মালদহের কালিয়াচকের জাল টাকার কারবারিরা দিশাহারা। মাওবাদী সংগঠনের হাতে যে বিপুল পরিমাণ টাকা আছে তারাও বিপদে পড়েছে। বিহার, ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকে প্রায় ২ কোটি বাতিল টাকা উদ্ধার হয়েছে। তাদের ঘুম ছুটে গেছে। বহু ব্যবসায়ী, ডাক্তার, উকিলের রক্তচাপ বেড়ে গেছে। আর এই কারণেই দেখা যাচ্ছে কারো কারো শুরু হয়েছে হৃদ্‌কম্প, তাই চলছে লম্ফঝম্ফ।

—**সাতকড়ি ভুঁঞা সেনশর্মা,** মালদা।

সার্ধশতবর্ষে লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা

আশিস রায়

নিবেদিতার আসল নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানন নামে একটি ছোট শহরে ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর তাঁর জন্ম। পিতার নাম স্যামুয়েল রিচমন্ড নোব্‌ল, পেশায় ধর্মযাজক। মাতার নাম মেরি ইসাবেল। দশ বছর বয়সে তাঁর পিতার পিতার মৃত্যু হয়। অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন তাঁর মাতামহ হ্যামিলটন। মার্গারেটের স্কুল জীবন অতিবাহিত হয় কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে। মেধাবী ছাত্রী মার্গারেট বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বাইরেও প্রচুর পড়াশুনা করতেন। স্কুলজীবন শেষ করে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি শিক্ষয়িত্রীর জীবনে প্রবেশ করেন। কিছুদিনের মধ্যে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। লন্ডনের বুদ্ধিজীবী মহলে মার্গারেট একজন শক্তিশালী লেখিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাস্তব জীবনে সফল হলেও চার্চের অধীনে প্রথাগত ধর্মজীবন তাঁকে শান্তির সন্ধান দিতে পারেনি। জীবনের এই অশান্তি চিরকালের জন্য দূর হয়ে গেল ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে এক সন্ধ্যায় যখন স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনের এক অভিজাত পরিবারের বাড়িতে ভারতীয় বেদান্ত দর্শন ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেখানেই মার্গারেট স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করেন এবং তাঁর ধর্মব্যাখ্যা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হন। সেদিনই মার্গারেট মনে মনে স্বামীজীকে গুরু বলে বরণ করে নিলেন। স্বামীজী মার্গারেটের মধ্যে নিষ্ঠা ও মানবদরদি মনের পরিচয় পেলেন। স্বামীজীর মতে ভারতকে যদি জাগ্রত করতে হয়, তবে নারীজাতির উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন, শিক্ষার

বিস্তার হলে নারীজাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে। মার্গারেটকে স্বামীজী এই কাজে উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন।

স্বামীজী তাঁর সামনে দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরাধীন ভারতের ছবি এবং এর আড়ালে যে আধ্যাত্মিকতার ঐশ্বর্যে পূর্ণ ত্যাগ ও তপস্যাময় এক মহান ভারতবর্ষের চিত্র তাঁর সামনে তুলে ধরেন। মার্গারেট ভারতবর্ষকে ভালবাসতে শুরু করেন। এরপর স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দিয়ে তাঁর নাম দেন নিবেদিতা। তাঁকে নির্দেশ দিলেন আজীবন কঠোর সংযম অবলম্বন করতে এবং বুদ্ধের মতো মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করতে। নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষের কল্যাণেই জগতের কল্যাণ। ১৯০২ সালে ৪ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ পরলোকগমন করেন। নিবেদিতা স্বামীজীর অসমাপ্ত কাজের বাস্তব রূপায়ণে ব্রতী হলেন। ভারতকে সবদিক থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সমগ্র ভারতকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করতে

নিবেদিতা আপ্রাণ চেষ্টা করেন। স্বামীজীর আদর্শকে সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতা ভারত জুড়ে বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি জনগণকে সবরকম সামাজিক ও ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের সেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বিশেষভাবে ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলামেশা করতেন। তাঁর মতে ভারতের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ভারতের পরাধীনতা। দেশকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য বাংলায় স্বদেশি আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের তিনি সাহায্য করেন। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান নেতা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্য বিপ্লবী নেতার সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি ভারতবর্ষকে নিবেদিতা স্বদেশ বলে গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ সালে প্লেগরোগ কলকাতায় মহামারী আকার ধারণ করলে নিবেদিতা মিশনের সন্ন্যাসীদের নিয়ে সেবা কাজে নেমে পড়েন। নিবেদিতা নিজেই ঝাড়ু- বালতি নিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার করতেন এবং রোগীর সেবা করতেন। নিবেদিতার ভালবাসা ও সেবার কোনো তুলনা ছিল না। পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও বন্যা দেখা দিলে লোকজন নিয়ে তিনি সেখানে সেবাকাজের জন্য উপস্থিত হন। দুঃখী মানুষেরা তাঁকে একান্ত আপনার জন বলে মনে করত।

নিবেদিতা যেমন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন, তেমনি ছিলেন শক্তিশালী লেখিকা। তিনি যেসব বই ও প্রবন্ধ লিখেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— 'Kali the Mother', 'Web of Indian Life', 'The Master as I saw Him' ইত্যাদি। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য সকলকে মুগ্ধ করত। তাঁর সময় ভারতীয় সমাজ খুব প্রাচীনপন্থী ছিল। অভিভাবকরা বাড়ির মেয়েদের পড়াশুনার পক্ষপাতী

ছিলেন না। বাগবাজারের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে নিবেদিতা ছাত্রী জোগাড় করতেন এবং তাঁদের ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতি পড়াতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেলাই, ছবি আঁকা, হাতের কাজও শেখাতেন। সন্ধ্যাবেলা মাঝেমাঝে পাড়ার মেয়েদের নিয়ে সভা করতেন। স্কুলের মেয়েরা নিবেদিতার বড় আদরের ছিল। তিনি তাদের খাওয়াতে ভালবাসতেন। আর্থিক অনটনের মধ্যে স্কুলের খরচ চালাবার জন্য তাঁর লেখা থেকে যা আয় হোত তার সবটাই ব্যয় করতেন। খুব কষ্টে জীবনযাপন করতেন। অল্প বয়সে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। বারবার অসুস্থ হয়ে পড়েন।

স্বামীজী তাঁকে দীক্ষা দিয়ে নিবেদন করলেন ভারতমাতার কাজে। ভার পড়ল তাঁর উপর দেশের মেয়েদের শিক্ষিত করবার। স্বামীজী চেয়েছিলেন শুধু বইপড়া শিক্ষা নয়, যে শিক্ষা চরিত্র গঠন করে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখায়, সেই হলো প্রকৃত শিক্ষা। স্বামীজীর আদর্শে ভগিনী নিবেদিতা মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে। সেখানে তাদের পড়াতেন, গান শেখাতেন, সেলাই ঘরকন্নার কাজ সব কিছুর হাতেখড়ি হোত নিবেদিতার কাছে। দিনরাত স্কুলের জন্য খাটতেন। এই স্কুলটি পরবর্তীকালে 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত হয়।

নিবেদিতার ছুটি নেই। মাঝেমাঝেই তাঁকে স্বামীজীর কথায় এখানে ওখানে বক্তৃতা করতে হয়। একবার কালীঘাট মন্দিরে মা কালীর বিষয়ে এক বক্তৃতা দিয়ে রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে ঝড় তোলেন। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বসু নিবেদিতার গুণমুগ্ধ হয়ে উঠেন। তাঁদের সঙ্গে নানা সমস্যা নিয়ে নিবেদিতা আলোচনা করতেন।

নিবেদিতার কথা ও কাজে ছিল দেশপ্রেমের আগুন। স্বামীজীর মৃত্যুর পর তিনি উপলব্ধি করলেন ভারতমাতা যতদিন পরাধীন থাকবে, ততদিন জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটবে না। তাই সর্বাগ্রে স্বাধীনতা চাই। জাতীয়তাবোধের নামে আগুন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, স্লোগান ছিল 'একজাতি একপ্রাণ একতা'। শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতাকে 'শিখাময়ী' বলতেন। নিবেদিতা ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে কোনো আপোশ মীমাংসায় আসতে চাইতেন না। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, এবিষয়ে তাঁর কণ্ঠ সবসময় চড়া সুরে বাঁধা থাকত। অনুশীলন সমিতির সদস্যরা তাঁর একান্ত আপনজন হয়ে উঠেন। তিনি তাঁদের সাহস জোগাতেন নিজের জীবন বিপন্ন করে। নিবেদিতা বাস্তবিক হয়ে উঠেছিলেন অগ্নিশিখা। নিবেদিতার সাহচর্যে, শিক্ষায় ও নির্ভীক উক্তিতে দেশের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ তথা ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনে বিপ্লবের অগ্নি জ্বলে উঠত। নিবেদিতা মাত্র ৪৪ বছর বেঁচে ছিলেন। ভারতে এসেছিলেন ১৮৯৮ এর জানুয়ারিতে। দেহত্যাগ করেন করেন দার্জিলিংয়ে ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর। এই ১২/১৩ বছর তিনি ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত ও অপমানিত পরাধীন ভারতকে আর কোনো বিদেশি তাঁর মতো এত আপন করে ভালবাসতে পারেনি। ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্ম নিয়ে এত গর্ববোধ, ভারতের জাতীয়তাবোধ জাগরণের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা—আর কোনো বিদেশির মধ্যে আমরা আজ পর্যন্ত দেখতে পাই না। ভারতকে ভালবেসে, নিজেকে পুরোপুরি ভারতের সেবায় নিবেদন করে গুরুর দেওয়া নিবেদিতা নাম সার্থক করে গেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে 'লোকমাতা' আখ্যা দিয়েছেন। নেতাজীর মতে, 'বিবেকানন্দকে আমি চিনেছি নিবেদিতার লেখায়'। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ভবিষ্যৎ ভারত সন্তানদের কাছে নিবেদিতা একাধারে জননী, সেবিকা ও বন্ধু।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

SMALL INVESTMENT TO FULFILL OUR FINANCIAL GOALS.....

SIP

SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN IN EQUITY MUTUAL FUNDS

What is SIP?

Like a recurring deposit, Systematic Investment Plan Works on the Principle of regular investments, where you put aside a small amount every month. What's more, you have the opportunity to invest in a Mutual Fund by making small periodic investments in place of a huge one-time investment. In other words, **Systematic Investment Plan** has brought mutual fund within the reach of common man as it enables anyone to invest with a small amount on regular basis.

START EARLY + INVEST REGULARLY +
INVEST FOR LONG TERM = WEALTH CREATION

DRS INVESTMENT

Contact : 9830372090, 9748978406

Email : drsinvestment@gmail.com

PMS | Mutual Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

এরউইন শ্রোয়েডিঙ্গার : (১৮৮৭-১৯৬১)

পরিচিতি : ইনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বৈজ্ঞানিক। তিনি 'ওয়েভ মেকানিক্সোর' উপর গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পান। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার তাঁর প্রবর্তিত 'শ্রোয়েডিঙ্গার ইকোয়েশন'। তাঁর লেখা বিখ্যাত বইটির নাম, 'বেসিক ভিউ অফ্ বেদান্ত' যা শংকারাচার্যের অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

উদ্ধৃতি : পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান অধ্যাত্মিক রক্তশূন্যতায় ভুগছে। তাই তাকে বাঁচানোর জন্য চাই প্রাচ্যের সঞ্জীবনী রক্তসঞ্চার।

উৎস : 'লং ওয়াক্ টু এনলাইটমেন্ট'—ড. থিল্লাইভেল নাইডু।

উদ্ধৃতি : সারা বিশ্বে এমন কোনো পরিকাঠামো নেই যাতে করে বহুত্ববাদের মধ্যে অদ্বৈতবাদ-কে প্রত্যক্ষ করা যায়। ব্যক্তির সাময়িক বহুত্বকে কাজে লাগিয়ে আমরা কিছু একটা করার চেষ্টা করি। কিন্তু তা মিথ্যা, একান্তই কৃত্রিম। তাই এই সংঘাতের একমাত্র সমাধান হবে, যা আমাদের কাছে এই মুহূর্তে আছে, তা হচ্ছে প্রাচ্যের ঔপনিষদিক নিগূঢ় জ্ঞানচর্চা করা।

উৎস : 'মাই ভিউ অফ্ দি ওয়ার্ল্ড'—এরউইন শ্রোয়েডিঙ্গার।

বি. দ্র. : শ্রোয়েডিঙ্গার প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্র পড়ে, তার দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, বিশেষ করে বেদান্ত দর্শন দ্বারা।

জুলিয়াস. আর. ওপেনহাইমার : (১৯০৪-১৯৬৭)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম পদার্থবিজ্ঞানী, যাকে বলা হয় 'আণবিক বোমার' জনক। তাঁর বিশেষ অবদান হলো : বর্ন-ওপেনহাইমার অ্যাপ্রক্সিমেসন, ইলেকট্রন- পসিট্রন-পসিট্রন থিয়োরি, ওপেনহাইমার-ফিলিপ্স প্রসেস এবং কোয়ান্টাম টানেলিংয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী করা। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য বিশেষ উদ্ভাবনগুলির মধ্যে আছে ব্ল্যাক হোল, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, কোয়ান্টাম ফিল্ড থিয়োরি, নিউট্রন স্টার এবং মহাজাগতিক তরঙ্গের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর আধুনিক মতবাদের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্ধৃতি : আমরা আধুনিক পদার্থ বিদ্যায় আজ যা দেখতে পাই তা প্রাচীন হিন্দু বিজ্ঞানের পরিমার্জিত রূপ, অনুপ্রেরণা আর অনুলিপি মাত্র।

উৎস : দি তাও অফ্ ফিজিক্স : ফ্রিট্‌জোফ কাপরা।

উদ্ধৃতি : ভারতের দর্শনশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ ভগবদ্ গীতায় লিখিত অতীন্দ্রিয় অনুভব এবং পাশ্চাত্যের যুগান্তকারী 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই, পরস্পর সহাবস্থান করতে পারে।

উৎস : দি আই অফ্ শিব : ইন্টার্ন মিস্টিসিজম অ্যান্ড সাইন্স : আমুরি দ্য রেইন্‌কোর্ট।

বি. দ্র. : ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই মাসে যেদিন প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণের সফল পরীক্ষা হয়, যা নিউ মেক্সিকোর 'ট্রিনিটি টেস্ট' নামে বিখ্যাত সেদিন ওপেনহাইমার এক আকস্মিক উচ্ছ্বাসে। ভগবদ্‌গীতার দুটি শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন : 'সহস্র সূর্যের দীপ্তিময় তেজোরাশি যখন একসঙ্গে আকাশে উদ্ভাসিত হয়—সেটাই হচ্ছি আমি। এখন আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়রূপী কাল'।

জন আর্চিবল্ড হুইলার : (১৯১১-২০০৮)

পরিচিতি : ইনি আমেরিকার প্রখ্যাত পদার্থবিদ। তিনি বহু বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনা করেছেন। তিনি নীলস্ বোরের সঙ্গে যুক্তভাবে 'দি মেকানিজম্ অফ্ নিউক্লিয়ার ফিসন' নামক প্রবন্ধ লেখেন। তিনি ছিলেন আণবিক বোমার অন্যতম কারিগর। তাছাড়া তিনি লস আলামসের পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন বোমার উপর গবেষণা করেন। তিনিই 'ব্ল্যাক হোল', 'কোয়ান্টাম ফোম' ও 'ওয়ার্ম হোল' প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টিকর্তা। আলবার্ট আইনস্টাইনের পর তিনিই সেই চেয়ারের উত্তরাধিকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

উদ্ধৃতি : আমাদের মনে হয় প্রাচ্যের মনীষীরা সবকিছুই জানতেন। যদি আমরা তাদের লেখাগুলি আমাদের ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারতাম, তাহলে আমরা সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতাম।

উৎস : 'আন্‌কমন উইসডোম' : ফ্রিট্‌জোফ কাপরা।

উদ্ধৃতি : এটা ভারতে অবাক লাগে যে শ্রোয়েডিঙ্গার, নীল্‌স বোর এবং ওপেনহাইমারের মতো বিজ্ঞানীগণ উপনিষদের ছাত্র ছিলেন।

উৎস : 'ইন্ডিয়ান কন্‌কোয়েস্ট অফ্ দ্য মাইন্ড'—শৈবাল গুপ্ত।

উদ্ধৃতি : আমার ভাবতে ভাল লাগে যে একদিন নিশ্চয় কেউ খুঁজে বের করবে কীভাবে ভারতের নিগূঢ় জ্ঞানবিজ্ঞান গ্রীসে এসে পৌঁছেছিল এবং সেখান থেকে আজকের আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনকে তা কীভাবে প্রভাবিত করেছে।

উৎস : 'ইন্ডিয়ান কন্‌কোয়েস্ট অফ্ দ্য মাইন্ড' :— শৈবাল গুপ্ত।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি। সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী, নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

শঠে শাঠ্যং

ছাগলের খিদে

তিনমাথা গ্রামের হরিপদ পোদ্দার খুব চালাক চতুর মানুষ। তার নানান কিসিমের ব্যবসা। তবে যে জন্য সে পাঁচ গাঁয়ে পরিচিত তা হলো তার ছাগল। সে ছাগল পোষে। অনেকগুলো ছাগল। এর থেকে আয়ও ভালো হয়। গ্রামের অনেকে আজকাল ছাগলের দুধ খায়। অনেকের আবার নানান অসুখের কারণে ছাগলের দুধ খেতে হয়। বছরে দু'বার করে ছাগলের বাচ্চা হয়। বড় হলে হরিপদ সেগুলো বেচে দেয়। এই ছাগল পোষা হরিপদর একরকম নেশা হয়ে গেছে। খরচ কিছুই নেই, শুধু আয় আছে। সকালে উঠেই তার কাজ ছাগলগুলোকে দুইয়ে মাঠে ছেড়ে দেওয়া। ছাগলগুলো সারাদিন এদিক সেদিকে মানুষের ফসল খেয়ে ঘরে ফেরে। কেবল মাঝে মাঝে কচি পাঁঠাগুলোর ওপর নজর রাখতে হয়। কে কখন ধরে কেটে খেয়ে নেবে!

হরিপদর এই আয়ের কারবার অনেকদিনের। গ্রামের মানুষের অনেক নালিশ তার এই ছাগল পোষা নিয়ে। সবার মত, তুমি ছাগল পুষবে তো বেঁধে রাখো। ঘাস কিনে খাওয়াও। মানুষের ফসল নষ্ট করা কেন? কিন্তু হরিপদ কারো কোনো কথায় কান দেয় না। সে রোজ ছাগল ছেড়ে দেয়। রোজ অন্যের ফসল খেয়ে যায়।

এইভাবে বেশ চলে যাচ্ছিল। সমস্যা শুরু হলো গ্রামে খোঁয়ার বসাতে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে গ্রামে একটা খোঁয়ার বসানো হয়েছে। এতদিন সবাই হরিপদর কাছে নালিশ করতো, দুটো কটু কথা বলে গালমন্দ করতো। এখন আর কেউ বলতে আসে না— তোমার ছাগল আমার ফসল খেয়েছে। ছাগল ধরে সোজা খোঁয়ারে চালান করে দেয়। এই নতুন বিপদে হরিপদ পোদ্দার বেজায় অসুবিধায় পরে গেছে। তার ছাগল পোষা না লাটে ওঠে এই ভয়ে থাকে সারাক্ষণ। রোজই কেউ না কেউ তাঁর ছাগল খোঁয়ারে পোরে। মোটা টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে

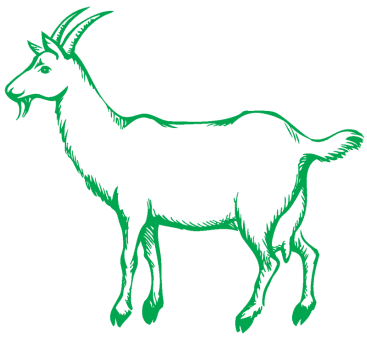

আনতে হয়। অনেক ভেবে হরিপদ ছাগলগুলোকে ট্রেনিং দেওয়ার চেষ্টা করলো। কেউ ধরতে এসে কীভাবে দৌড়ে পালাতে হবে। কিন্তু নাঃ, কিছুতেই কিছু হলো না।

কী করা যায়, ছাগল বেঁধে রাখতে হচ্ছে। গাছের ডালপালা ভেঙে, ঘাস কিনে ছাগলের পেট ভরাতে হচ্ছে। কিন্তু এভাবে চলে কদিন? কয়েকদিন ধরে চিন্তাভাবনা করে হরিপদ একটা ফন্দি বের করলো। গ্রামে সে ঘোষণা করে দিল, যে তার একটি ছাগলের পেট ভরিয়ে দিতে পারবে তাকে সে দুটি ছাগল দেবে। আর না পারলে উল্টো, তাকে একটি ছাগল দিতে হবে। সবাই ভাবলো এ আর কী কাজ। অনেকে ছাগল নিতে এলো। হরিপদ গ্রামের পঞ্চায়েতকে সাক্ষী রেখে খালপাড়ের হরেন মাজিকে একটা ছাগল দিল। চারদিনের মাথায় প্রমাণ করতে হবে ছাগলের পেট ভরেছে। হরেন ছাগলটাকে বাড়ি এনে এক বস্তা ঘাস খেতে দিল। ছাগল সারাদিন সেই ঘাস খেল। পরের দিন আরো এক বস্তা। ছাগল তাও খেয়ে নিল। পরেরদিন আবারও এক বস্তা। ছাগল সেদিন সব ঘাস খেল না। এবার চতুর্থ দিন প্রমাণ দেবার পালা। পঞ্চায়েত এসেছে, গ্রামের লোকেরা এসেছে। হরিপদ প্রমাণ করার জন্য এক বস্তা ঘাস ছাগলের সামনে রাখলো। ঘাস পেয়ে ছাগল তা খেতে শুরু করলো। হরিপদ বলল— আপনারা সবাই দেখুন, হরেন আমার ছাগলকে তিন দিন না খাইয়ে রেখেছে। শর্ত মতো ওকে একটা ছাগল কিনে দিতে হবে। হরেন অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু কে শোনে তার কথা। অগত্যা একটা ছাগল কিনে দিতে হলো হরেনকে। হরিপদর এই চালাকি অনেকে ধরতে পেরেছে। ছাগলকে যতই খাওয়াও ছাগলের পেট কখনো ভরে না।

হরেনের ছেলে রতন। সে হরেনের থেকে চালাক। রতন একদিন সকালে হরিপদ পোদ্দারের বাড়ি এসে বলল— আমার বাবা তো আপনার ছাগলের পেট ভরাতে পারেনি, আমাকে দেন তো আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। হরিপদ মনে মনে খুব খুশি হয়ে একটা ছাগল তাকে দিয়ে দিল। রতন ছাগলটাকে বাড়ি নিয়ে এসে দড়ি খুলে দিল। সামনে রাখলো একবস্তা ঘাস। ঘাস দেখে ছাগল দৌড়ে খেতে এলো। রতন একটা ছড়ি দিয়ে ছাগলের মুখে দিল একটা মার। ম্যাঁ ম্যাঁ করতে করতে ছাগল পালিয়ে গেল। একটু পরে ছাগল আবার এলো ঘাস খেতে। রতন আবার দিল মার। তিন দিন এই চলল। ছাগল এখন আর ঘাস দেখলে খেতে আসে না। দৌড়ে পালায়।

চতুর্থ দিন প্রমাণ করার পালা। অনেক মানুষ জমেছে তামাশা দেখার জন্য। হরিপদ হাসি হাসি মুখে ছাগলটাকে ছেড়ে দিয়ে এক বস্তা ঘাস রাখলো সামনে। কিন্তু ঘাস দেখে ছাগল দৌড়ে পালিয়ে গেল। হরিপদ হতভম্ব! এটা কী করে হয়, ঘাস দেখে ছাগল পালাচ্ছে কেন? তার মানে ছাগলের পেট ভরা।

কিছু করার নেই, হরিপদকে এখন শর্ত পূরণ করতে হবে। বাধ্য হয়ে হরেনকে দুটো ছাগল দিতে হলো। হরেন ছাগল দুটো নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরলো। কিছুদিন পর শোনা গেল হরিপদ নাকি তার সব ছাগল বেচে দিয়েছে!

ত্রিদিব সোম

রাজ্য পরিচিতি

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

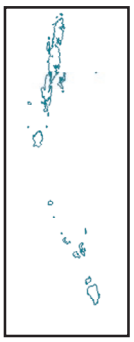

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এটি বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। রাজধানী পোর্টব্লেয়ার। এখানকার বিচার বিভাগ কলকাতা হাইকোর্টের অধীন। মোট আয়তন ৮২৪৯ বর্গকিলোমিটার ও জনসংখ্যা ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৫০০ জন। ঐতিহাসিকভাবে এই দ্বীপপুঞ্জ আদি জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজ সরকার এখানে একটি বন্দি নিবাস তৈরির পরিকল্পনা করে। পরবর্তীতে এখানে তৈরি হয় সেলুলার জেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনী আন্দমান ইংরেজদের হাত থেকে উদ্ধার করে নাম রাখেন শহিদ দ্বীপ ও স্বরাজ দ্বীপ। পরে দেশ স্বাধীন হলে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হয়। আন্দামানে বহু বাঙালির বাস। এছাড়াও দক্ষিণ ভারতীয় বহু মানুষের বাস এখানে। ভারতের পর্যটনের মানচিত্রে আন্দামান অন্যতম। ভারতীয়দের কাছে সেখানকার সেলুলার জেল একটি পবিত্র ক্ষেত্র। কারণ সেই জেলে কত বিপ্লবী দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।

এসো সংস্কৃত শিখি

কর্তুং শক্যম্, কিঞ্চিত্ সময়: অপেক্ষ্যতে।
করতে পারি, কিন্তু কিছু সময় চাই।

এতাবত্ তু কৃতবান্।
এতটা তো করেছি।

দ্রষ্টুম্ এব ন শক্যতে।
দেখতেই পাচ্ছি না।

তত্রৈব কুত্রাপি স্যাত্।
ওখানেই কোথাও আছে।

যথার্থ বদামি।
সত্যি বলছি।

ভালো কথা

যোগ অভ্যাস

সঙ্ঘের কার্যালয় কেশব ভবনে শুরু হলো যোগ অভ্যাস। সঙ্ঘের প্রচারক আশিসদার উদ্যোগে প্রথমে ভবনে যারা থাকেন তাদেরকে নিয়েই শুরু হয়। এখন ধীরে ধীরে পাড়ার লোকেরাও আসতে শুরু করেছে। আমার বাবাও যাচ্ছেন। সন্ধ্যেবেলা মাদুর বিছিয়ে যোগ অভ্যাস হয়। গত ১২ জানুয়ারি থেকে সেখানেই একটি যোগ সেন্টার চালু হয়েছে। নাম বিবেকানন্দ যোগ অভ্যাস সংস্থা। মহিলা পুরুষ সবাই যেতে পারবে সেখানে।

শুভম পাল, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

পিঠেপুলি

তোতন ঘোষ, চতুর্থ শ্রেণী

পৌষ এলো শীত নিয়ে
পিঠেপুলি তার সাথে
তেলপিঠে পাটিসাপটা
সারাদিন খাওয়াদাওয়া।

পৌষ পার্বণের সকালবেলা
তেল মেখে স্নান করা
মা ঠাকুমার হাতে গড়া
পিঠেপুলি স্বাদে ভরা।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 7059591955
E-mail : swastika5915@gmail.com
মেল করা যেতে পারে।

বৃন্দাবন
নির্বাসিতা বিধবাদের শেষ আশ্রয়

অনন্যা চক্রবর্তী

বৃন্দাবনে আশ্রয় নেওয়া বিধবাদের জীবন কাটে ভিক্ষে করে। ভদ্র ভাষায় মাধুকরী। আর যখন মারা যান তাদের শরীর ছোট ছোট টুকরো করে কেটে চটের থলেয় ভরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কয়েক মাস আগে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা ঘটনাটিকে 'মর্মান্তিক' বলে আখ্যা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে মৃত বিধবাদের শেষকৃত্য যাতে ঠিকমতো সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করার জন্য মথুরা সিভিল হাসপাতালের চিফ মেডিক্যাল অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই কোন যুগ থেকে বৃন্দাবন আর বারাণসী সারা দেশের বিধবাদের কাছে শেষ আশ্রয় রূপে পুণ্যভূমি হিসেবে পরিচিত। 'আমাকে এবার কাশীতে রেখে আয়' —এই সংলাপটি একসময় বাংলা সিনেমায় মলিনা দেবী- সন্ধ্যারানিদের মুখে খুবই জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু যা ছিল বাণপ্রস্থ তাই হয়ে দাঁড়াল নির্বাসন! সম্প্রতি বৃন্দাবন থেকে কয়েকজন বিধবা মহিলা কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁরা কেউ অতীত মনে রাখতে চান না। এমনকী আত্মগ্লানিতে ভরপুর বর্তমানের কথা বলতেও বাধে। সারাক্ষণ মুখে হাসি। ছটফটে আমুদে ভাব। শুধু সময় যখন বাইরের খোলসটা ছিঁড়ে ফেলে তখন সব শূন্য মনে হয় অসমের ছবি শর্মা বলেন, 'আমার ছেলে আছে। তারও পরিবার আছে।' এইটুকু বলে ছবি থামেন। তারপর উদাস গলায় বলেন, 'ছেলে আমার যত্নআত্তি করত। আমিই চলে এলাম।' তরুলতা দাস, আর একজন নির্বাসিতা। কপালে রসকলি, গলায় কণ্ঠী। তরুলতার বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। সেখানে তাঁর দুই ছেলে পরিবার-সহ বসবাস করেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তরুলতা বলেন, 'আমি দূর থেকেই তাদের আশীর্বাদ করছি। প্রার্থনা করি আমার নাতিনাতনিরা যেন তাদের বাবা-মাকে বুড়ো বয়সে দেখে।' ললিতা সিংহের দৃষ্টিভঙ্গি একটু অন্যরকম। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে নেই, তিনটিই মেয়ে। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে তো আর থাকা যায় না।' ললিতাদেবীর রংমপার্টনার সত্যভামাদেবী মানসিকতায় আরও আধুনিক। কিন্তু যখন তিনি বলেন, 'এখন সময় বদলে গেছে। ছেলেমেয়েরা এখন আরও স্বাধীনতা চায়। বুড়ো মাকে দেখার তাদের সময় কোথায়। হয়তো আমরাই তাদের ঠিকমতো মানুষ করতে পারিনি!' —তখন তার বুকে জমে থাকা অভিমানের উৎসটিকে চিনতে কারও অসুবিধে হয় না।

পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষায়-সংস্কারে উপযুক্ত করে তোলা সত্যিই খুব কঠিন কাজ। কেউ পারেন, অনেকে পারেন না। সৌভাগ্য, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কথা মনে রেখেছেন। সম্প্রতি বৃন্দাবনের বিধবারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাখি পরিয়েছেন। কেউ কেউ খোলাখুলি স্বীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রীই তাদের শেষ আশা। সরকার যে তাদের প্রত্যাশাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে তার প্রমাণ কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী মানেকা গান্ধীর ঘোষণা। তিনি বলেন, '২০০১ সালে নারী ও শিশুকল্যাণ নীতি ঘোষিত হবার পর নারীর ক্ষমতায়ণ সংক্রান্ত ধারণা আমূল বদলে গেছে। এখন আর শুধু ভাতা দিয়ে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি করা যাবে না। দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশীদার করে তুলতে হবে।'

একথা ঠিক এখন দেশের মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ বয়সে তরুণ। কিন্তু তাই বলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অবহেলিত নন। প্রবীণদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি যাতে আরও আধুনিক করা যায় তার জন্য চেষ্টা করছে সরকার। সরকারি কর্মসূচিতে প্রবীণদের উপযোগী একটি সার্বিক সামাজিক সুরক্ষা পরিকাঠামো তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বৃন্দাবনে বসবাসকারী বিধবাদের জন্য ১০০০ কক্ষবিশিষ্ট একটি আবাস নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে আত্মীয়- পরিজনহীন প্রায় ৬ হাজার বিধবা বৃন্দাবনে থাকেন। পুনর্বাসনের কাজ শেষ হলে তাদের মধ্যে অনেকেই মাথার ওপর ছাত পাবেন। বাকি থাকবে শুধু পায়ের নীচে মাটি। জীবনধারণের সামান্য কিছু পুঁজির সংস্থান করা যায় কিনা তাও ভেবে দেখছে সরকার। এই সরকারের হৃদয় আছে। হয়তো ভবিষ্যতে এরকম কোনো প্রকল্প আমরা দেখতেও পাব।

কিন্তু সরকার কোনোদিনই আইন করে সন্তানকে মাতৃবৎসল করে তুলতে পারবে না। এ দায় সন্তানকেই নিতে হবে। নয়তো মায়ের চোখের জল চোখেই শুকিয়ে যাবে।

সম্পূর্ণ পৃথক পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছে নীতি আয়োগ

অতিথি কলম

অরবিন্দ পানাগড়িয়া

আমাদের দেশের চিরকালীন স্থিতাবস্থায় বিশ্বাসী অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলি কখনই তাদের প্রাধান্য খর্ব হতে পারে বা দেশের অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে কোনো বড়-সড় সদর্থক পরিবর্তন আনার সম্ভাবনাময় সিদ্ধান্তগুলিকে সুদৃষ্টিতে দেখেনি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১২টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণকারী যোজনা পরিষদ (Planning Commission)-এর কাজকর্ম পূর্বাপর পর্যালোচনা করে দেশে ২০১৪ সালে ক্ষমতাসীন এন ডি এ সরকার এই পরিকল্পনা তৈরি, তার পদ্ধতি, রূপায়ণ, কার্যকারিতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি নতুন ভাবে দৃষ্টি দেওয়ার ভাবনায় 'নীতি আয়োগ' নামে একটি সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। পূর্বেকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কেন্দ্র থেকে যা কিছু পরিকল্পনা স্থিরীকৃত করে তা দেশের রাজ্যগুলির ওপর নিজস্ব প্রয়োজন নিরপেক্ষ ভাবে চাপিয়ে দেওয়ার নীতি থেকে বেরিয়ে এসে এই আয়োগ সরাসরি দেশের রাজ্যগুলির কাছ থেকে তাদের প্রয়োজন মাফিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করার ব্যবস্থা নেয়। ২৯টি রাজ্যের পরিকল্পনা ও তাদের আর্থ-সামাজিক ও পরিকাঠামোগত চাহিদা ভিন্ন হতে বাধ্য আর সেগুলিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বা সঙ্গে নতুন কিছু প্রস্তাব সংযোজিত করে সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করাই এই আয়োগের মূল উদ্দেশ্য। যথারীতি প্রথম দিকে কোনও কোনও রাজ্য বিরোধিতা করে আয়োগের সম্মেলন-সভা বয়কট করার চেষ্টা করেছিল। এখনও কোনও কোনও রাজ্য তথা দেশবাসীর মনে বসে থাকা দ্বিধাগুলি নিয়ে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন আয়োগের প্রথম উপ-চেয়ারপার্সন (Deputy Chairperson) সুপণ্ডিত অর্থনীতিবিদ অরবিন্দ পানাগড়িয়া। —**সম্পাদক**

নীতি আয়োগের বয়স ২ বছর হলো। এই উদ্‌যাপন মুহূর্তে আয়োগ কেমন কাজ করছে, তার পরিকল্পনা পদ্ধতি আগের যোজনা কমিশনের থেকে কতটাই বা পৃথক ও কার্যকরী সেগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করার একটা সুযোগ এসেছে।

যোজনা কমিশনের মূলত দু'টি প্রধান কাজ ছিল— (১) দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি তৈরি করা ও রাজ্যে রাজ্যে তার রূপায়ণ করা। এই সূত্রে নির্দিষ্ট অর্থবরাদ্দ করাও ছিল অন্যতম কর্মসূচি। নীতি আয়োগের কিন্তু এই ধরনের বাধ্যতামূলক কোনো নির্ধারিত কাজ নেই। দেশের দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আগামী ৩১ মার্চ শেষ হতে চলেছে। এটিই হবে দেশের শেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন নীতি আয়োগ দেশের রাজ্যগুলিকে কোনো ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারণ করে দেয় না। দেশের চতুর্দশ অর্থ কমিশন কেন্দ্রের সংগৃহিত অর্থ থেকে রাজ্যগুলিকে ৪২ শতাংশ হারে তাদের বরাদ্দ দিয়ে দেয়। রাজ্যকে দেওয়ার মতো কোনো অর্থনীতি আয়োগের হাতে আদৌ অবশিষ্ট থাকে না। সে বিধানই নেই। আগে যেমন দেখা যেত যোজনা কমিশনের তোড়জোড় শুরু হলেই রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা করজোড়ে কেন্দ্রের কাছে তদবির শুরু করতেন যাতে অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায়, তা আজ অতীত। তাহলে আয়োগের কাজ কী?

নবীন নীতি আয়োগের মূল তিনটি কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা যাক। (১) দেশের সমবায় ব্যবস্থাগুলিকে উৎসাহ প্রদান, (২) রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক আত্মনিয়ন্ত্রণকে সমর্থন দান, (৩) দেশের সরকারের চিন্তা ভাণ্ডার হিসেবে সদা উদ্ভাবনাশক্তির পরিচয় দেওয়া। দেশের সামগ্রিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাহায্য করা যার অঙ্গ। এই তিনটি কাজই একে অপরের পরিপূরক— কখনই একে অন্যের থেকে আলাদা নয়।

গত ২০১৫ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের নিয়ে আয়োজিত প্রথম সম্মেলন দিয়েই এই আয়োগের কাজ শুরু হয়। প্রথম সভাতেই বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে তৈরি হয় তিনটি সাবগ্রুপ যারা কেন্দ্র সরকারকে— (১) কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প, (২) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি (৩) স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প নিয়ে সরকারকে যথোপযুক্ত উপদেশ দেবে। এছাড়া একই সঙ্গে দু'টি Task force ও গঠিত হয় যারা কৃষি ক্ষেত্রের দ্রুত উন্নতি সাধন ও দারিদ্র্যদূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশ করবে। একই ধরনের Task force আবার রাজ্যে রাজ্যেও সমান্তরাল ভাবে গঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে নির্দিষ্ট সাবগ্রুপগুলি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তাদের কাজ শেষ করে খুব তাড়াতাড়ি রিপোর্ট পেশ করে। দু'টি টাস্ক ফোর্সও এদের পথেই চলে। এই ৫টি সংস্থার দেওয়া সুপারিশগুলির অধিকাংশই হয় রূপায়িত হয়েছে, কিছু কিছু বিবেচনাধীন। অন্যদিকে রাজ্যগুলিতে সংস্থার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আয়োগ সাহায্য করছে। আয়োগের উদ্যোগে

একটি আদর্শ জমি লিজ দেওয়ার প্রথা তৈরি করা হয়েছে যা মধ্যপ্রদেশ সরকার ইতিমধ্যেই সফলভাবে রূপায়িত করেছে আর উত্তর প্রদেশ সরকার রাজ্যে বলবৎ থাকা জমি আইনের সঙ্গে নতুন ধারাগুলিকে নিজেদের সুবিধেমত পরিমার্জন করে আইনে পরিবর্তন করে নিয়েছে। অন্য অনেক রাজ্যও এই নতুন আদর্শ আইনটি তাদের রাজ্যে প্রয়োগ করার সক্রিয় তোড়জোড় করছে।

এরই পাশাপাশি আয়োগের তরফে কৃষিপণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বড় মাপের সংস্কার আনার প্রচার চলছে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আয়োগ রাজ্যে রাজ্যে দীর্ঘ দিন থেকে কেন্দ্রের নানান দপ্তরে কারণহীন বা অতি তুচ্ছ কারণে আটকে থাকা অসংখ্য বিষয় ও রাজ্যের উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক নানান প্রকল্পগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির কাজে ব্যস্ত। নানা রাজ্যের আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করে তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে কেবলমাত্র রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে খাপখেতে পারে এমন সেরা উপদেশগুলিই আয়োগ দিয়ে চলেছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের আমলাদের অভিমত একত্রিত করে তবেই কোনো পরামর্শ দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় স্তরে নীতি নির্ধারক সংস্থা হিসেবে আয়োগ দীর্ঘদিন ধরে রুগ্ন সরকারি সংস্থাগুলিকে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করেছে। এগুলিকে বন্ধ করার পরামর্শও তারা সরকারকে দিয়েছে যার ভিত্তিতে ১৭টি এমন সংস্থার বিলোপের পদ্ধতিগত কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এছাড়া চালু রয়েছে এমন কিছু সরকারি সংস্থার কৌশলগত বিলগ্নীকরণের সুপারিশও করা হয়েছে। দেশের অর্থমন্ত্রক এখন দ্রুত এই বিক্রয় প্রক্রিয়া যাতে সম্পন্ন করে তার ওপর আয়োগ নজর রাখছে। বলা দরকার, দেশের চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষানীতি ও প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে বরাবরের Indian Medical Council Act (1956) তুলে দিয়ে Medical Education Commission Act তৈরি করার সুপারিশ করেছে আয়োগ। এই প্রস্তাবিত আইনে পড়ুয়াদের ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে পাশ করার পরও একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বসতে হবে। এতেই দেশের ছোট বড় নামি-অনামি সব কলেজের চিকিৎসকদের পারদর্শিতা একই মানদণ্ডে যাচাই হওয়ার সুযোগ থাকবে। এটি একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন হতে পারে। দেশের মানুষজন হয়তো চিকিৎসাক্ষেত্রে কিছুটা পরিষেবার উৎকর্ষের সংস্পর্শে আসতে পারবেন। ক্যাপিটেশন ফি-এর মাধ্যমে প্রবেশিকা পরীক্ষা ব্যতিরেকেই ডাক্তার হওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে তাঁদের হাতেই পড়ে রুগীর জীবন। এবার পাশ পরবর্তী পরীক্ষা ফিল্টারের কাজ করতে পারে। একটি জাতীয় শক্তি-নীতি দেশের বৃহত্তর নাগরিকদের পর্যালোচনার জন্য ইতিমধ্যেই পেশ করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দেশের মধ্যে বিশ্বমানের ২০টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পে আয়োগ UGC Act 1956 রও সংস্কার করার প্রস্তাব দিয়েছে। ১৯৮৭ সালের কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রের AICTE আইনেরও পর্যাপ্ত সংস্কার করাই আয়োগের অভিমত। সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচের দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে Coastal Employment Zone তৈরি করে যথেষ্ট বেশি টাকা মাইনের চাকরি সৃষ্টি করার এক পরিকল্পনা আয়োগ সরকারকে দিয়েছে।

থিঙ্ক ট্যাঙ্ক অভিধায় ভূষিত হওয়ায় এরই অঙ্গ হিসেবে আয়োগ দেশ পরিচালনার সেরা নিদান হিসেবে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। রাজ্যের আধিকারিকদের নিয়ে সম্মেলন করে বইটির অন্তর্গত প্রণালীগুলির সুবিধে ও কার্যকারিতা তাদের মধ্যে সফলভাবে নিজে ক্ষেত্রে প্রয়োগের ওপর জোর দিচ্ছে। এ বিষয়ে বহু কর্মশালারও আয়োজন করা হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে শুধু তাৎক্ষণিক নয়, আয়োগ ৩ বছর থেকে শুরু করে ৭ বছর ও দীর্ঘমেয়াদি ১৫ বছর অবধি দেশে আমূল পরিবর্তন উপযোগী Action Plan Document তৈরির কাজে এখন লেগে রয়েছে।

'ভারত বদলাও' শীর্ষক বক্তৃতামালা আয়োজন করে আয়োগ বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন থারমান শন্মুগরতনম্ যিনি সিঙ্গাপুরের উপপ্রধানমন্ত্রী বা বিল গেটের মতো বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বদেরও হাজির করেছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গোটা মন্ত্রীসভা ও বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আমলারাও এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। অন্যদিকে Atal Innovation Mission-এর অধীনে আয়োগ দেশব্যাপী একটি সজীব ও নিরাপদ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় উপযোগী পদ্ধতি নির্মাণে নতুন বিনিয়োগকারীদের তৈরির কাজে রত। এই যোজনার অধীনে শিগগিরিই প্রাথমিকভাবে দুশো বিদ্যালয়ে একেবারে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে নতুন গবেষণাগার তৈরি করা হবে যেখানে নিত্য নতুন উদ্ভাবনী প্রতিভাগুলি দেশের পক্ষে উপযোগী এমন পন্থা নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করতে পারে।

নীতি আয়োগ তার গঠনের সময় ১২০০ লোকের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে শুরু করতে বাধ্য হয় যা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এখন এই সংখ্যা কাটছাঁট করে ৫০০। কিন্তু আয়োগ ইতিমধ্যে বাইরে থেকে ৪৫ জন পেশাদারি তরুণ প্রতিভাবান ও ১২ জন অভিজ্ঞ আধিকারিককে নিয়োগ করেছে। এঁদের যোগদানে আয়োগের কাজকর্মে বাড়তি উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

পরিশেষে জানাই, দু' বছর আগে যখন প্রধানমন্ত্রী প্রথম আমায় এই কাজের জন্য আহ্বান জানান তখন ভারত বদলানোর প্রতিজ্ঞায় তাঁকে সহযোগিতা করার গৌরবের ভাবনা আমার নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে ভয়ের চিন্তাকে অনায়াসে অতিক্রম করেছিল। আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার রসদ পেয়েছিলাম। আমি সেই মুহূর্তেই তাঁর ডাকে সানন্দে সাড়া দিই। নীতি আয়োগের কর্মীরা বিগত দু' বছরে যে কাজ করে দেখিয়েছেন তার জন্য আজ আমি নিজেকে গর্বিত বলে মনে করছি। আমার বিশ্বাস তিন বছরের শুরু থেকেও আমরা সাফল্যের সেই ধারাকে প্রবহমান রাখব।

(লেখক নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারপার্সন)

সত্যিকারের বামপন্থার সন্ধানে

প্রবাল চক্রবর্তী

তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। সে বছর স্কুলে এক বিতর্কসভার আয়োজন হয়েছিল। বিতর্কের বিষয় ছিল, 'ভারত কোনোকালেই এক অখণ্ড সমাজ ছিল না।' আমি খুশি হতাম, এই বিষয়টার বিপক্ষে বক্তব্য রাখতে পারলে। কিন্তু সে বিকল্প আমাকে দেওয়া হয়নি। আমার দায়িত্ব পড়ল, বিষয়ের পক্ষে বক্তব্য রাখার। অর্থাৎ, ভারত অখণ্ড নয়, এটা প্রমাণ করার। স্কুলের শিক্ষকরা অধিকাংশই ছিলেন বামপন্থী। তাঁদের পরামর্শ ছিল, ভারতের 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান' ব্যাপারটাকে ব্যবহার করে আক্রমণাত্মকভাবে প্রমাণ করতে, ভারতীয় সমাজ অখণ্ড নয়। আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এ বিষয়ে। বাবা একটা অন্য আইডিয়া দিয়েছিলেন। সেই আইডিয়াটা আমার বেশ পছন্দ হলো। ঠিক করলাম, বিতর্কে ওটাই ব্যবহার করব। পরিকল্পনার এই পরিবর্তনের কথা স্কুলের শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছে গোপন রেখেছিলাম।

বিতর্কের দিনে ভাষণ দিতে উঠে শিক্ষকদের অবাক করে দিয়ে 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান' ব্যাপারটার উল্লেখমাত্র করলাম না। তাঁর বদলে বললাম, শর্মিলা ঠাকুর যখন পাতৌদিকে বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, তখন তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। কেন? উনি কেন স্বধর্মে নিষ্ঠ থেকে পাতৌদিকে বিয়ে করতে পারলেন না? একজন শিখ বা বৌদ্ধকে বিয়ে করলে তো ওনাকে এভাবে ধর্মান্তরিত হতে হোত না। ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে থেকেও ইসলামিক জনগোষ্ঠী নিজেদের চারপাশে এক এক্সক্লুসিভ জোন তৈরি করেছে। এই ঘটনাটাই প্রমাণ করে, ভারত এক অখণ্ড সমাজ নয়। এভাবে ধর্মান্তরকরণ ভারতীয় সমাজের ঐক্যের পরিপন্থী। যতদিন এরকম ধর্মান্তরকরণ ঘটতে থাকবে, ততদিন আমরা দাবি করতে পারি না যে, ভারতীয় সমাজ অখণ্ড। আমার সেই বক্তব্য স্কুলের শিক্ষকদের পছন্দ হয়নি। বিতর্ক শেষে তাঁদের কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলাম, কেন আমি অফিসিয়াল লাইন 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান' ব্যাপারটা বাদ দিয়ে বিয়ের মাধ্যমে ইসলামে ধর্মান্তরকরণ ব্যাপারটাকে ভারতীয় সমাজে বিভেদের উৎস হিসেবে উপস্থাপিত করলাম। সেদিন সেই বিতর্কে জিততে পারিনি। খুশি হয়েছিলাম তাতে। আমার হারের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলাম, ভারত এক অখণ্ড সমাজ। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই দেখিয়ে দিয়েছিলাম, বিভেদের বিষবীজ কোথায় পোঁতা রয়েছে।

আমার বাবাও বামপন্থী ছিলেন। কিন্তু আমার স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর কোথাও একটা তফাত ছিল। দেশভক্তির প্রশ্নে বাবার আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর দূরদর্শিতার কথা ভেবে আজও অবাক হই। সে সময় 'লাভ জিহাদ' কথাটা কেউ শোনেনি। বাবা কিন্তু সেদিনও ভারতীয় সমাজের এই ভয়ঙ্কর সমস্যাটুকু বুঝেছিলেন, আমাকে বুঝিয়েও দিয়েছিলেন। একটা জিনিস সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম। বামপন্থীদের যেরকমটি হওয়া উচিত, আমাদের দেশের অধিকাংশ বামপন্থীরা যেন তার ঠিক উল্টো। এরা ভারতের ঐক্যে অস্বস্তিবোধ করে। হিন্দুরা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে কট্টর ইসলামিস্টে পরিণত হলে এরা আনন্দিত হয়। সে বিষয়ে নিয়ে যে-কোনোরকম আলোচনা এরা এড়িয়ে যেতে চায়। একমুখে এরা বলে, আমরা ধর্মমত মানি না, দুজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পরস্পরকে বিয়ে করতেই পারে। অন্যদিকে সেই বিবাহের মাধ্যমে যদি হিন্দুসমাজের শক্তিক্ষয় হয়, তাতে এরা খুশিই হয়। কেন এই দ্বিচারিতা?

হ্যাঁ, আমার বাবা বামপন্থী ছিলেন। কিন্তু ওঁর কাছে আমি কখনো লেনিন বা কাস্ত্রোর গল্প শুনিনি। উনি আমাকে সবসময়ই ভারতীয় বিপ্লবীদের গল্প বলতেন। ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা, অরবিন্দ বা নেতাজী সুভাষের গল্প। বাবা বিশ্বাস করতেন, ভারতীয় বামপন্থাকে ভারতের মাটি থেকেই উদগত হতে হবে। সেই ভারতীয় বামপন্থার শিকড় থাকতে হবে ভারতীয় পরম্পরায়, ভারতীয় মনীষীদের জীবনীতে। না হলে সে বামপন্থার অকালমৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু বাবার সেই যুগটা ছিল বড্ড খারাপ। সেসময় পশ্চিমবঙ্গে সোভিয়েত-মার্কা বামপন্থার এমন দাপট ছিল, যে নেতাজীর ফরোয়ার্ড ব্লককেও বিশ্ববিপ্লবপন্থীদের দলে নাম লেখাতে হয়েছিল। আমার বাবা তাঁর জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণের দোষে বামপন্থী মহলে পাত্তা পাননি। আজ তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্যি হয়েছে দেখে খুব ভালো লাগছে। সোভিয়েত-নিষ্ঠ ও চীন-নিষ্ঠ বিশ্ববিপ্লবপন্থীরা আজ মতাদর্শ, সরকারি ক্ষমতা, গণভিত্তি— সবকিছু খুইয়ে সর্বহারা। যে সর্বহারার নাম ভাঙিয়ে ওরা মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসেছিল, তাদেরই সারিতে এসে দাঁড়াতে হয়েছে ওদের। এর থেকে বড় প্রতিশোধ মহাকাল আর কী নিতে পারতেন!

আমি জানি না, আমি বামপন্থী না দক্ষিণপন্থী। তবে ফিদেল কাস্ত্রোকে আমার দরকার নেই। আমার কাছে রাসবিহারী বসু কাস্ত্রোর থেকে অনেক বড় বিপ্লবী। গোর্কির মাদার নয়, আমার প্রিয় বিপ্লবী উপন্যাস বঙ্কিমের আনন্দমঠ, শরৎচন্দ্রের পথের দাবি। চে গুয়েভারার টিশার্ট পরার আমার কোনো শখ নেই। হ্যাঁ, বিনয়-বাদল-দীনেশের ছবিওলা একটা টিশার্ট যদি পাই, গর্বভরে পরবো সেটা। যখন কেউ আমাকে 'গেরিলা যুদ্ধ' কথাটা বলেন, আমার মনে যে ছবিটা ভেসে ওঠে, সেটা কিউবা বা নিকারাগুয়ার জঙ্গলের নয়। আমি দেখতে পাই, পশ্চিমঘাট

পর্বতমালার বন্ধুর শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গল ফুঁড়ে এগিয়ে চলেছেন চিরবিদ্রোহী ছত্রপতি শিবাজী। ঝটিকা আক্রমণে বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে বিদেশি শাসকের ঘুম কেড়ে নিচ্ছেন।

বামপন্থা ব্যাপারটা আসলে কী, সত্যি করে বলুন তো? কারা বামপন্থী? কারাই বা দক্ষিণপন্থী? আজ সেটা চেনা বড় দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকী, বামপন্থা-দক্ষিণপন্থার সংজ্ঞা নিয়েই বড় একটা প্রশ্ন উঠে গেছে আজ। নরেন্দ্র মোদী যখন বিমুদ্রাকরণ করলেন, তখন আর সব বিরোধীদের সঙ্গে ভারতের বামপন্থীরাও উঠে পড়ে লাগলো, মোদীর প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে। ব্যাপারটা খুব অবাক-করা। যারা নিত্যদিন বলে, গজদন্তের মিনার থেকে বড়লোকদের টেনে নামিয়ে তাদেরকে গরিবদের সঙ্গে এক পংক্তিতে এনে দাঁড় করাতে হবে, তারা কেন বিমুদ্রাকরণে খুশি হলো না? দেখা যাচ্ছে, ভেনেজুয়েলার আগমার্কা বিপ্লবী নেতা হুগো চাভেজের শিষ্য নিকোলাস মাদুরো মোদীর দেখাদেখি নিজের দেশে বিমুদ্রাকরণ করেছেন। উদ্দেশ্য একই— কালোটাকা, সংগঠিত অপরাধ ও কালোবাজারির ওপর নিয়ন্ত্রণ। সাহসী এই পদক্ষেপের জন্য বিশ্বজুড়ে বামপন্থী মহলে উনি বেশ প্রশংসাও পাচ্ছেন। বস্তুত, প্রশংসার যোগ্য কাজই করেছেন মাদুরো। হুগো চাভেজের ব্যর্থ নেতৃত্ব ও খনিজ তেলের নিম্নমুখী দাম; এই দুই কারণে দেউলিয়া হবার দশা হয়েছিল ভেনেজুয়েলার। একদিকে ড্রাগ কার্টেল ও অন্যা অপরাধী দলগুলোর হাতে জমেছিল অগাধ কালোটাকা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছিল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস জোগাড় করতে। কর্মদিন সপ্তাহে মাত্র দু'দিন, তার বেশি কাজও নেই কোথাও। ভেনেজুয়েলার এটাই শেষ সুযোগ, সর্বব্যাপী বিনাশকে এড়িয়ে যাওয়ার। আর সেই কাজটাই মাদুরো করেছেন। অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য কাজ। অথচ, মাদুরোর পথপ্রদর্শক মোদী সেই একই কাজ আরো অনেক বড় আকারে করেও বামপন্থীদের প্রশংসা পান না। একই কাজ ভেনেজুয়েলায় করলে সেটা হয় বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, আর ভারতে করলে সেটা হয় পুঁজিবাদের দালালি— এটা কী করে মানা যায়? মোদীকে কেউ বামপন্থী বা বিপ্লবী বলে না। ওঁর পার্টি বিজেপি দক্ষিণপন্থী পার্টি হিসেবেই পরিচিত। আর এখানেই হিসেবটা গুলিয়ে যাচ্ছে। আজ মোদী যে কাজটা করলেন, সেটা অন্য কেউ করলে নিশ্চয়ই 'বিপ্লবী অভিনন্দন' আর 'লাল সেলাম'-এর বৃষ্টি শুরু হয়ে যেত। মোদীর ভাগ্যে তার কিছুই জুটলো না। তাই প্রশ্ন জাগে, এই বামপন্থা ব্যাপারটা আসলে কী?

ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গেই গণতন্ত্রের প্রথম স্বাদ পায় ইউরোপ। সেসময় ফ্রান্সের পার্লামেন্টে যারা বাঁদিকে অর্থাৎ বিরোধীপক্ষে বসতো, তাদের মতবাদগুলোই পৃথিবীতে বামপন্থী মতাদর্শ হিসেবে পরিচিত হয়েছিল। যেমন— সামাজিক সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা, যুদ্ধবিরোধিতা, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা ইত্যাদি। এইসব মতাদর্শের ভাবমূর্তির জোরেই বামপন্থীরা এতকাল চালিয়ে নিচ্ছিলো। কিন্তু আজ এই ২০১৭ সালের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বজুড়ে বামপন্থার নামে যা ঘটেছে যা ঘটছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই বামপন্থার ঘোষিত নীতিগুলির সাক্ষাৎ বিপরীত। বিশেষ করে ভারতবর্ষে বামপন্থার যে হাল হয়েছে, সেটা দেখে বামপন্থা-দক্ষিণপন্থার সংজ্ঞাটাই গুলিয়ে যাচ্ছে।

যেমন ধরুন, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা। এ বিষয়ে ভারতীয় বামপন্থীদের ট্র্যাকরেকর্ড কী বলছে? ইংরেজ আমলে বামপন্থীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনকে 'সাবোটাজ' করেছিল। স্বাধীনতার পর নেহরু, তারপরে ইন্দিরা ও তস্য সন্ততিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রসেবশে রেখেছিল নিজেদেরকে। কখনো সরকারের ভেতরে, কখনো সরকারের বাইরে থেকেছে তারা, কিন্তু কোনোকালেই কংগ্রেস সরকারের বিপরীতে সত্যিকারের বিরোধীর ভূমিকা পালন করেনি। লাটিয়ানের দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে বহু কু-আচার সেই ইংরেজ আমল থেকেই বাসা বেঁধেছিল। হরকিষণ সিং সুরজিৎ থেকে সীতারাম ইয়েচুরি— কেউই সেইসব কু-আচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেননি। বরং সেগুলোর সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিয়ে আরাম-আয়েশে দিন কাটিয়েছেন। প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার কোনো নামগন্ধ দেখা যায়নি এঁদের মধ্যে। আজ যখন দেখছি, নরেন্দ্র মোদী তাঁর দলবল নিয়ে কদলীবনে মত্ত হস্তীর মতো লাটিয়নের দিল্লিতে ঢুকে পড়েছেন, ভুলুণ্ঠিত করছেন একটার পর একটা শতাব্দী প্রাচীন কু-আচারকে, তখন মনে হচ্ছে, এই বিপ্লবটা তো ভারতবাসী বামপন্থীদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছিল! অথচ করল সেটা বিজেপি, যাদের নাকি সবাই দক্ষিণপন্থী অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানপন্থী হিসেবে অভিহিত করে। অবাক কাণ্ড নয় কি?

সামাজিক সাম্যর ক্ষেত্রেও এই তথাকথিত বামপন্থীদের ভূমিকা হতাশাজনক। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ বামপন্থী শাসনে গরিব-বড়লোকের বিভেদ বেড়েছে শতগুণ। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এক ব্যবসায়ীর টাকা খেয়ে আরেক ব্যবসায়ীর ব্যবসায় লালবাতি জ্বেলেছে। ক্ষতি হয়েছে শ্রমিকদের, মেহনতী মানুষদের। শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের পরিবর্তে তাদের লুম্পেনিকরণ করেছে এইসব নেতারা। কলকারখানা অফিসকাছারি বন্ধ হয়ে মধ্যবিত্ত হয়েছে সর্বহারা, বাঙালি মেধা হয়েছে রাজ্যছাড়া। বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এরা বেছে বেছে শ্রমিকদরদি শিল্পদ্যোগীদের পায়ে কড়ুল মেরেছে। কারখানা বন্ধ হয়ে তার জমিতে তৈরি হয়েছে বহুতল আবাসন। পরম্পরাগত বাঙালি মালিকানার চা-বাগানগুলো জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের জেরে বিক্রি হয়ে গেছে অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে। সবই বামপন্থী ট্রেডইউনিয়ন নেতাদের যোগসাজশে। এক বিখ্যাত পক্ষীবিশারদ তথা পক্ষীপ্রেমী সম্পর্কে শুনেছিলাম, পাখির মাংস ছাড়া আর কোনো মাংস তাঁর মুখে রুচতো না। প্রতিদিন ডিনার টেবিলে পাখির মাংস তাঁর চাইই চাই। ভারতের বামপন্থী নেতাদের অধিকাংশই এই গোত্রের গরিবপ্রেমী। গরিবের মাংস না হলে এঁদের মুখে রোচে না!

কলকাতা ও তিরুবন্তপুরমের রাজপথে বামপন্থীরা অনেক যুদ্ধবিরোধী মিছিল করেছে। সেসব মিছিল পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হয়ে জনমানসে দাগ ফেলতে পারেনি। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া যতদিন নিরপেক্ষ ছিল, ততদিন সে যুদ্ধ ছিল পুঁজিবাদী বাজার দখলের যুদ্ধ। সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল পাপ। কিন্তু যেই রাশিয়া সে যুদ্ধে যোগ দিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো জনগণের যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী বর্ণবৈষম্যবাদী শোষক ইংরেজের সৈন্যদলকে ভারতের গরিব মানুষের রক্তে পুষ্ট করতে নেচে গেয়ে লেগে পড়ল কমিউনিস্ট পার্টি ও তার শাখা-সংগঠন পি এন টি। এরকমই হাজার পক্ষপাতদোষে ভরা ওদের যুদ্ধবিরোধিতা। চীন ভারত আক্রমণ করলে ওরা মিছিল করেছে ভারতের বিরুদ্ধে। স্তালিন-চেসেস্কুর যুদ্ধবিলাসিতায় ও গণহত্যায় ওরা থেকেছে নীরব। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পতাকার রং দেখে বামপন্থীরা ঠিক করেছে, যুদ্ধ সমর্থন করবে না বিরোধিতা করবে। এরা শুধু ফাঁপরে পড়েছিল একবার; চীন যখন ভিয়েতনাম আক্রমণ করেছিল। তখন ওদের দশা ছিল, শ্যাম রাখি না কুল রাখি। দু'দিকেই তো লালমার্কা দেশ, কাকে বকি আর কার পিঠ চাপড়াই? না, যুদ্ধবিরোধীর ভূমিকা এমন পক্ষপাতী হতে পারে না। এখানেও ভারতের বামপন্থীরা ডাহা ফেল।

ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে বামপন্থীদের ভূমিকা সবচেয়ে হতাশাজনক। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ, ধর্মমত নির্বিশেষে সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার। তার বিকৃত অর্থ এদেশের বামপন্ধীরা করল— সংখ্যালঘুদের সঙ্গে বিশেষ সহিষ্ণুতা! ভেবেছিল, এতে ওদের সাংগঠনিক স্বার্থ চরিতার্থ হবে, সংখ্যালঘুরা দলে দলে যোগ দেবে ওদের পার্টিতে। বাস্তবে সেটা মোটেই হয়নি, উল্টে একটি বিশেষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বামপন্থীদের এই অদূরদর্শিতার ভরপুর সুযোগ নিয়েছে। তারা যত অসহিষ্ণু হয়েছে, বামপন্থীরা তত তাদের সঙ্গে সহিষ্ণু (!) হয়েছে। অসহিষ্ণুর সঙ্গে সহিষ্ণু হলে তো অসহিষ্ণুতার পরিবেশ বেড়েছে, ধর্মীয় হানাহানি বেড়েছে। কালোদিনে ভারতীয় বামপন্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে জিহাদিদের তল্পিবাহক এজেন্ট। এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে হিন্দুত্ববাদীরা বলছে— সবার সঙ্গে ন্যায়বিচার, কাউকে তোষণ নয়। এটাই কি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা নয়?

এবার বলুন, ফরাসী বামপন্থার কষ্টিপাথরে বিচার করে আজকের পরিস্থিতিতে কাকে বেশি বামপন্থী মনে হচ্ছে--- কমিউনিস্টদের, নাকি হিন্দুত্ববাদীদের?

দত্তপন্ত ঠেংড়ী ছিলেন হিন্দুস্তান সোশালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, যাদের ঘোষিত নীতি ছিল ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা। এই দত্তপন্ত ঠেংড়ীর আরেকটা পরিচয় আছে। আজীবন আর এস এসের প্রচারক ও চিন্তানায়ক, সঙ্ঘের শ্রমিক-সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ ও ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাও এই একমেবদ্বিতীয়ম্ দত্তপন্ত ঠেংড়ীরই হাতে। ওঁর গড়া ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ আজ ভারতের বৃহত্তম শ্রমিক-সংগঠন। এর থেকে অনুমান করা কঠিন নয়, বামপন্থী পরম্পরার শিকড় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কতটা গভীরে প্রোথিত। কিন্তু সে বামপন্থা বিদেশ থেকে ধার করা বামপন্থা নয়, ভারতবর্ষের মাটি থেকে উদগত সত্যিকারের বামপন্থা। আজকের ভোগবিলাসী বামপন্থী নেতাদের দেখুন, পাশাপাশি আর এস এসের প্রচারকদের সন্ন্যাসীর মতো জীবনচর্যা দেখুন। কারা বামপন্থী জীবনচর্যার আদর্শ নিজেদের জীবনে সত্যিকারের রূপায়িত করেছে? তথাকথিত বামপন্থীরা, নাকি তথাকথিত দক্ষিণপন্থীরা? অথচ লোকে বলে, লাল পতাকা মানে বামপন্থী, আর গেরুয়া পতাকা মানে দক্ষিণপন্থী। এমনটা কেন?

লাল পতাকার পেছনে একটা ইতিহাস রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বারো ঘণ্টার বদলে আট ঘণ্টার কর্মদিনের দাবিতে শ্রমিকরা যখন মিছিল করেছিল, পুঁজিবাদী মদতপুষ্ট পুলিশরা তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল। নিহত এক সঙ্গীর রক্তে ভেজা জামা পতাকা হিসেবে তুলে ধরেছিল এক শ্রমিক। বামপন্থী লাল পতাকার সেটাই সূত্রপাত। অর্থাৎ, বামপন্থী লাল পতাকা শ্রেণীসংগ্রাম তথা শ্রেণীসংঘর্ষের প্রতীক। এই প্রতীক সমাজে বৈষম্যের সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু সংঘর্ষ ভিন্ন সমাধানের অন্য কোনো পথ দেখাতে পারে না। নিরন্তর সংঘর্ষ ও রক্তপাত কোনো সমাধান আনতে পারে না। শ্রমের রক্তপতাকা তাই শ্রমিকের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ। তুলনায় গেরুয়া পতাকা প্রথম সূর্যের কিরণের প্রতীক। অজ্ঞানতিমির-বিদারী জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার প্রতীক। ভারতের বিশ্বাস, যাবতীয় অনাচার ও শোষণের মূলে রয়েছে অজ্ঞানতা। তাই গেরুয়া পতাকা মানবসমাজের শোষণমুক্তির প্রতীক। এই প্রতীক সংঘর্ষের ক্ষুদ্র আবর্তে আবদ্ধ নয়, এই প্রতীক সর্বজনীন। আজকের যুগ থেকে ভবিষ্যতের শোষণমুক্ত যুগ, এবং তার পরেও আবহমানকাল ধরে মানবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম গেরুয়া পতাকা। তবে কেন এমনকী আমাদের এই ভারতবর্ষেও গেরুয়া পতাকার পরিবর্তে লাল পতাকা বামপন্থার প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো? এ প্রশ্ন আমাদের দেশের বামপন্থীদের নিজেদের কাছেই করতে হবে।

কার্লমার্কস বলেছিলেন, মানবসভ্যতার প্রগতি ঘটবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, আগামী দিনের ভারত বেরোবে ভুজাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। এই দুই ভবিষ্যদ্‌বাণীর মধ্যে নিহিতার্থের কোনো তফাত রয়েছে কি? আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত দুটি মতবাদের উদগাতাই বলছেন, সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের হাতেই রয়েছে সমাজের ভবিষ্যৎ, তাদের প্রগতি বিনা সমাজের প্রগতি অসম্ভব। এই সাদৃশ্যটাকে চিরকাল এড়িয়ে গেছে ভারতের বামপন্থীরা, অন্ধ নকলনবিশী ও ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবর্তী হয়ে। উল্টে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবিঠাকুরের নামে অকথা-কুকথা বলেছে। কেন? এর উত্তরে খোঁজাটা আজ জরুরি।

ভারতের বামপন্থীদের মূল সমস্যা রয়েছে তাদের মৌলিকতার অভাবে, তাদের অন্ধ অনুকরণপ্রিয় নীতিবাগিশতায়। রাশিয়ার বিপ্লবীরা এককালে ঠিক করেছিল, অতীতের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ছেদ করে নবীন এক আন্তর্জাতিক সমাজ নির্মাণ করবে। তাই তারা দেশের নতুন নাম রেখেছিল 'সোভিয়েত'। সেই উদ্ভট ভুলেভরা নীতি ওরা বিশ্বসুদ্ধ

কমিউনিস্টদের শিখিয়েছিল। কিন্তু রাশিয়ানরা নিজেরাই সে নীতি বেশিদিন আঁকড়ে থাকতে পারেনি। হিটলার যখন রাশিয়া আক্রমণ করল, তখন স্তালিন রাশিয়ার জনগণকে দেশরক্ষার যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে সোভিয়েত বা কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের বড়াই না করে দেশবাসীকে রাশিয়ার অতীত গৌরবের কথা, জার পিটার ও জেনারেল সুভোরবের কথা বলে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আজ চীনের কমিউনিস্টরা কনফুসিয়াসের দর্শনকে চীনা সাম্যবাদের অপরিহার্য অঙ্গ মেনেছে। ভারতের তথাকথিত বামপন্থীরা কিন্তু আজও হিন্দুত্ব সম্পর্কে নিজেদের বস্তাপচা মূল্যায়ন বদ্‌লায়নি। জাতীয়তাবাদকে এরা আজও প্রগতির শত্রু মনে করে। যে-কোনো ভারতীয় পরম্পরাই এদের কাছে পশ্চাদগামী চিন্তা।

বামপন্থীদের আরেকটি বড় সমস্যা হলো, তারা মনে করে, শাসনতন্ত্র দখল করে তার সংস্কারসাধন করলেই সে শাসনতন্ত্র গরিবের মঙ্গলসাধন করতে পারবে। এই চিন্তাটা নিতান্তই একপেশে। শাসকের সদিচ্ছা শাসনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। শাসনতন্ত্র যতই ভালো হোক না কেন, সদিচ্ছাহীন লোকের হাতে পড়লে সেই তন্ত্রকে ব্যবহার করে শাসক গরিব মানুষের চরম শোষণ করতে সক্ষম। এই সত্যটি বামপন্থীরা বুঝেও বোঝে না। গরিব মানুষের কল্যাণে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তন্ত্রের নয়, সদিচ্ছার। পৃথিবীর ইতিহাস তা প্রমাণ করে দিয়েছে। আর এই সদিচ্ছা কীভাবে তৈরি করা যায়, সেই বিষয়ের ওপর ভারতীয় মনীষীরা যুগ যুগ ধরে যে গবেষণা করে এসেছেন, পৃথিবীতে তা তুলনারহিত। হিটলার থেকে স্তালিন সকলেই সমাজতন্ত্রের নাম করে আসলে যেটা চালিয়েছে, তার সোজাসাপটা নাম— স্বৈরাচার। হিটলারের স্বৈরাচারী সমাজতন্ত্রে ছিল বর্ণবৈষম্যের মিশেল, স্তালিনের স্বৈরাচারী সমাজতন্ত্রে মিশেল ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদের ইউটোপিয়ার। এদের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে ভারতের উপলব্ধি— রাজশক্তির ওপর লোকশক্তির অঙ্কুশ শোষণহীন সমাজের একমাত্র গ্যারাণ্টার। সমাজতন্ত্রের এই বিকল্প পথটিকে অন্বেষণ করার সময় এসেছে।

খাঁটি বামপন্থী সংস্কৃতি কী হওয়া উচিত? আমার কাছে বামপন্থীর সত্যিকারের অর্থ হলো—'বহুজন হিতায় বহুজনে সুখায়' থেকে সর্বজন হিতায় সর্বজন সুখায়-তে উত্তরণ। এটাই সত্যিকারের বামপন্থা। আর এটাই তো হিন্দুত্ব। দুইয়ের মধ্যে আমি তো কোনো তফাত দেখতে পাই না। পৃথুরাজা বলেছিলেন, আমার রাজ্য চাই না, সুখভোগও চাই না। আমি শুধু চাই দুঃখী প্রাণীর দুঃখ দূর করতে। একজন সত্যিকারের বামপন্থীরা মনোভাব কী হওয়া উচিত, তা পৃথুরাজার মতো আর কেউ বলতে পারেনি। হেগেল বা কার্ল মার্কস নয়, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনও নয়, মাও জে দং তো নিশ্চয়ই নয়।

আমার বাবার মতো অনেক বাঙালিই এককালে বামপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, গরিব মানুষের কল্যাণ। দেখা যাচ্ছে, লাল পতাকাধারী ভারতের বামপন্থীরা সেই উদ্দেশ্য পূরণে পুরোপুরি ব্যর্থ। যাঁরা আজও গরিব কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষ তথা সর্বহারার মঙ্গল চান, তাঁদের জন্য এটা ভেবে দেখবার সময়। লাল পতাকার তলায় যে নকলনবিশ বামপন্থী আন্দোলন ভারতে গড়ে উঠেছিল, প্রকৃতির নিয়মেই তার মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু মেহনতি মানুষের শোষণমুক্তির প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি। আগামী দিনের বামপন্থা ভারতের মনীষীদের বহু সহস্র বৎসর ধরে আহরিত জ্ঞানকে লোককল্যাণে ব্যবহার করবে। ভারতের শাশ্বত সনাতন অপৌরুষেয় সংস্কৃতিকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে বিকশিত হবে সে। সত্যিকারের সেই বামপন্থার উদয় হচ্ছে গেরুয়া পতাকার তলায়। তার মাধ্যমেই হবে মেহনতি মানুষের শৃঙ্খলমুক্তি, ঘটবে মানবসমাজের উত্তরণ।

(লেখক প্রবাসী বাঙালি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া)

কর্মখালি

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশনা, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণীকে সহায়তা প্রদান এবং জাতীয় স্বার্থের অনুপন্থী সভাসমিতি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত একটি এনজিও নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করছে।

১. **অফিস ম্যানেজার :** প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অবশ্যই এমবিএ (রেগুলার কোর্স) হতে হবে। সেইসঙ্গে থাকতে হবে বন্ধুভাবাপন্ন এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্ব। বাংলা এবং ইংরেজি দুটি ভাষাতেই সচ্ছন্দ হওয়া ও কম্পিউটারে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সংস্থা প্রার্থীর আত্মমর্যাদাবোধ, নিজেকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা, দলের একজন হয়ে কাজ করার মানসিকতা, সহকর্মীদের প্রতি সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলার মনোভাব প্রত্যাশা করে। প্রথম ছয়মাস অস্থায়ী কর্মী (বেতন ছয় হাজার টাকা) হিসেবে কাজ করার পর উপযুক্ত বিবেচিত হলে উচ্চ বেতনে নিয়োগ করা হবে। বয়সসীমা অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

বিজ্ঞাপন প্রবন্ধক : প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এমবিএ হওয়া আবশ্যক। সেইসঙ্গে থাকতে হবে অ্যাডভার্টাইজিংয়ে ডিপ্লোমা। প্রার্থী অবশ্যই আত্মবিশ্বাসী, ফলাভিমুখী, জনসংযোগে দক্ষ এবং বাংলা ও ইংরেজিতে সমান সচ্ছন্দ ও কম্পিউটারে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তোলা এবং তার প্রকাশনা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে প্রার্থীকে দায়বদ্ধ হতে হবে। সংস্থা প্রার্থীর আত্মমর্যাদাবোধ, নিজেকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা, দলের একজন হয়ে কাজ করার মানসিকতা, সহকর্মীদের প্রতি সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলার মনোভাব প্রত্যাশা করে। প্রথম ছয়মাস অস্থায়ী কর্মী হিসেবে (বেতন ৬০০০ টাকা) কাজ করার পর উপযুক্ত বিবেচিত হলে উচ্চ বেতনে নিয়োগ করা হবে। বয়সসীমা অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

দরখাস্ত করুন নীচের ঠিকানায় :—

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬, E-mail : swastika5915@gmail.com

ইন্দো-ভুটান সীমান্তে ভারতের প্রথম স্মার্ট ভিলেজ

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্মার্ট সিটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের প্রকল্প। স্মার্ট ভিলেজ বলে কোনো প্রকল্প এখনও তৈরি হয়নি। কিন্তু শহর থেকে অনেক দূরে ইন্দো-ভুটান সীমান্তের লাগোয়া, দুর্গম অবৈধ অনুপ্রবেশে দীর্ণ বড়সিমলাগুড়ি ভারতের প্রথম স্মার্ট গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ইন্দো-ভুটান সীমান্ত থেকে মাত্র ১১ কিলোমিটার দূরে বক্সা জেলার বড়সিমলাগুড়ি গ্রাম। কী নেই সেখানে! প্রত্যেক বাড়িতে টয়লেট, সৌরবিদ্যুৎ,পরিস্রুত পানীয় জল। এসব সম্ভব হয়েছে নন্দ তালুকদার ফাউন্ডেশনের (এন টি এফ) ঐকান্তিক প্রয়াসে। সংস্থার সচিব মৃণাল তালুকদার বলেন, 'অসমের প্রায় ২০,০০০ গ্রামে অজস্র সরকারি প্রকল্পের কাজ চলছে। কিন্তু কোনো গ্রামই এখনও পর্যন্ত স্মার্ট গ্রাম হতে পারেনি। আমরা একটিমাত্র গ্রাম বেছে নিয়েছিলাম যাতে সেই গ্রাম আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারে।' বড়সিমলাগুড়িকে স্মার্ট গ্রাম বানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ২০১৪ সালে। মৃণাল তালুকদার বলেন, 'আমি আর আমার এক বন্ধু গ্রামীণ অসমের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলাম। আমাদের লক্ষ্য ছিল জঙ্গি অনুপ্রবেশে দীর্ণ একটি গ্রামকে আদর্শ গ্রাম বানাব।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা চারটি ক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলাম। বিকল্প শক্তি, পরিস্রুত পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি। সেই সঙ্গে ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ আরও বাড়ানো, খেলার মাঠ তৈরি করা, স্বাস্থ্যশিবির পরিচালনা এবং গ্রামে একটি শস্যব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা।'

২০১৪ সালেই প্রকল্পের ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডি পি আর) তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্পনসর জোগাড় করা তত সহজ ছিল না। মৃণাল বলেন, 'আমরা প্রজেক্টের কাজ ঠিকমতো করতে পারব কি না তাই নিয়ে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। শুধু একটি গ্রামে কাজ করতে চাই বলেও অনেকের আপত্তি ছিল। আমরা হতাশ হইনি। শেষে ইন্ডিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইনান্স কর্পোরেশন লিমিটেড আমাদের প্রজেক্ট স্পনসর করার জন্য এগিয়ে এল।' ২৩৪টি চাষি পরিবার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং দিনমজুরের বাসভূমি বড়সিমলাগুড়িকে স্মার্ট গ্রাম বানানোর প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হলো ২০১৫ সালের ১৫ জানুয়ারি। এদিন গ্রামেরই বাসিন্দা দীনেশ ভুঁইয়া এবং দীপু চৌধুরির নেতৃত্বে ভিলেজ ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। পানীয় জল পরিস্রবণের প্ল্যান্ট বসিয়ে কমিটি তার জয়যাত্রা শুরু করে। সম্ভবত সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই গ্রামেই রিভার অসমোসিস প্রযুক্তি-নির্ভর ওয়াটার প্ল্যান্ট রয়েছে।

প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রামোন্নয়ন কমিটির ওপর ন্যস্ত। গ্রামের লোকেরা মাসে ১২০ টাকা করে চাঁদা দেন। দীপু চৌধুরি বলেন, 'আগে জলবাহিত বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য ওষুধ কিনতে পরিবারপিছু আমাদের প্রত্যেক মাসে অন্তত ৩০০ টাকা করে খরচ হোত। সেই তুলনায় ১২০ টাকা কিছুই নয়।' জল পরিস্রবণের পরের ধাপে ছিল ঘরে-ঘরে শৌচালয় তৈরি। খোলা জায়গায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে অভ্যস্ত গ্রামে শৌচালয় তৈরি করা বেশ কঠিন ব্যাপার। প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর সুরজিৎ দত্ত বলেন, 'আমরা ঠিক করেছিলাম এক বছরে অন্তত ১০০ টয়লেট বানাব। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। বিশেষ করে বর্ষাকালে। তবে আমরা কাজটা শেষ করতে পেরেছি। পরিবারপিছু ১৬০০০ টাকা করে খরচ হয়েছে।' সুরজিৎ জানান এরপর তারা ঘরে ঘরে সৌরবিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার কাজ শুরু করেন। আলোকিত করে তোলেন গ্রামের রাস্তাও।

এখনও পর্যন্ত ১০০টি পরিবারের হাতে সোলার হোম কিট তুলে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে রাজস্থান ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট সংস্থা। কিটে রয়েছে একটি ব্যাটারি, সোলার প্যানেল, ট্রান্সফর্মার, ৩টি এলইডি লাইট এবং একটি পাখা। এছাড়া এনটিএফ গ্রামে শস্যব্যাঙ্ক তৈরি করেছে। দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে ভিলেজ উওমেন কমিটি। সব মিলিয়ে সত্যিই স্মার্ট ভিলেজ। অর্থাৎ গ্রাম আছে কিন্তু গ্রাম্যতা নেই। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

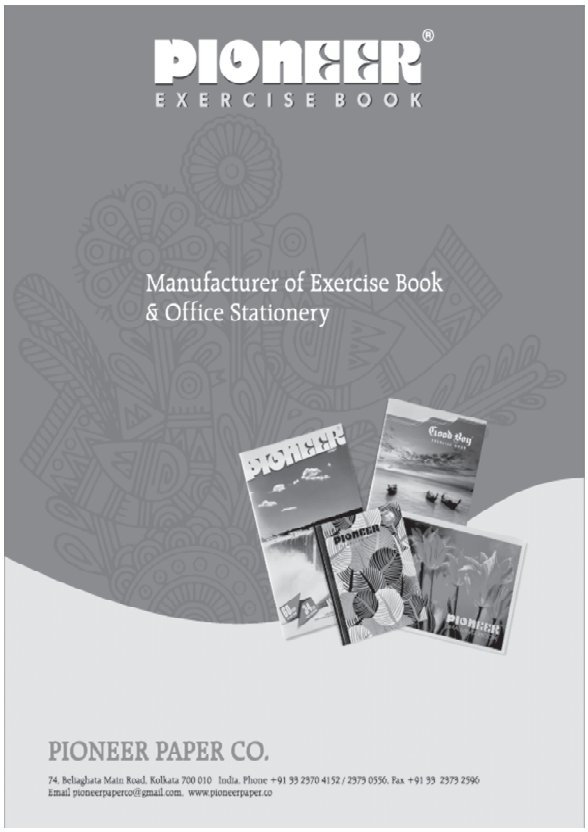

''অবিরাম প্রার্থনা এবং অশ্রুতপূর্ব তপস্যা মিলিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে এমন এক গভীর ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, যাতে অহংবোধের লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। রামকৃষ্ণ পরমহংস 'সমগ্রের' (পূর্ণ আদর্শের) এক সারসংক্ষেপ। আমাদের যে (ক্ষুদ্র) জীবনতরঙ্গ অনন্ত আত্মার চৈতন্যপ্রবাহে বিধৃত হয়ে সমুদ্রাভিমুখে ধাববান— তাঁর মতো মহান অতিচেতন সত্তাই কেবল সে তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারে। আমাদের পশ্চাতে এবং সম্মুখে যে শক্তি পরিব্যাপ্ত রয়েছে, তিনিই তার প্রমাণস্বরূপ।''

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

অর্শে হোমিওপ্যাথি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক (এম.ডি. হোমিও)

অর্শ রোগে অনেকেই ভোগেন। কিন্তু অর্শ রোগটি কী? মলদ্বারের শ্লৈষ্মিক স্তরের নীচের স্তরে এবং সরলান্ত্রের নিম্নস্তরের শিরাজালের স্ফীতির নাম অর্শ। সংক্ষেপে বলা যায় অর্শ হলো সরলান্ত্রের অথবা মলদ্বারের শিরাস্ফীতি বিশেষ। রোগের অবস্থা অনুসারে অর্শকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে মলত্যাগের সময় মলদ্বারের এবং সরলান্ত্রের শিরাজালের স্ফীতি বাইরে বেরিয়ে আসে না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বাইরে আসে মলত্যাগের সময়। কিন্তু মলত্যাগের শেষে ভিতরে ঢুকে যায় সঙ্গে সঙ্গে। তৃতীয় পর্যায়ে সবসময় বাইরে বেরিয়ে আসে। মলদ্বারের ঊর্ধ্বগামী অবাধ রক্তস্রোত প্রতিহত হলে শিরায় রক্ত জমে ফুলে উঠে। অর্শ নানা কারণে হতে পারে। তবে অতি সাধারণ কারণ কোষ্ঠকাঠিন্য।

অন্যান্য কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হৃৎপিণ্ডজনিত যেমন কনজিটিভ ফেলিওর, যকৃতজনিত যেমন সিরোসিস অফ লিভার, গর্ভাবস্থার মধ্যে বেশ প্রতিনিয়ত দাঁড়িয়ে কাজ করা, শিরা প্রাচীরের জন্মগত দুর্বলতা পারিবারিক ইতিহাস প্রভৃতি কারণে শিরা প্রাচীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে স্বাভাবিক সঙ্কোচন হয় না। ক্রমে তা একটি থলির মতো স্ফীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অর্বুদের মতো স্ফীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অর্বুদের মতো সরলান্ত্রের মধ্যে থেকে যায় অথবা মলদ্বারের কাছে ঝুলে পড়ে। অর্শ মটর দানার মতো ছোট অথবা বৃহৎ আখরোটের ন্যায় বড় হতে পারে এবং সংখ্যায় এক বা একাধিক থাকতে পারে। মলদ্বারের বাইরে অঙ্কুরগুচ্ছের মতো অর্শ ঝুলতে দেখা যায় অনেকের।

লক্ষণ ভেদে এই রোগের স্তর তিনটি। প্রথম স্তরে মলত্যাগের সময় টাটকা রক্তস্রাব হয়। দ্বিতীয় স্তরের রক্তস্রাব হয় বেশীমাত্রায়, মলত্যাগকালে মাংসতুল্য স্ফীত মলদ্বারের চারপাশে দেখা যায়। যন্ত্রণা থাকে না, থাকলেও তা সামান্য,

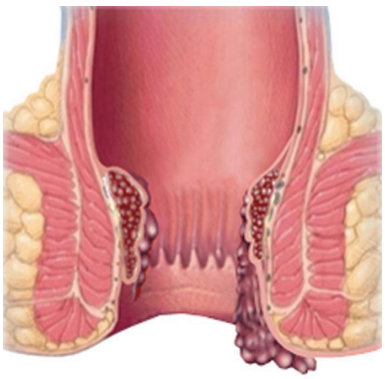

কিন্তু তাতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা মলদ্বারের চারপাশে সবসময় স্ফীতি লক্ষ্য করা যায়। অর্শের রক্ত মলের সঙ্গে মিশে থাকে। আবার বিন্দু বিন্দু বা পিচকারির মতো স্রাব হয়। অর্শের পরিণতি নানাভাবে হতে পারে রক্তাল্পতা, পচন, ভগন্দর, শিরা থ্রম্বোসিস এবং মলদ্বারের বাইরে অর্শ নির্গমন ও স্ট্রাঙ্গোলশন। রোগের পরিণতির কথা মনে রেখে সময়মতো চিকিৎসা হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক অবস্থায় কোমল শয্যায় রোগী চিৎ হয়ে শয়ন করবে এবং নিতম্বের নীচে বালিশ রেখে যতদূর সম্ভব উঁচু করে রাখতে হবে। যন্ত্রণার লাঘব হবে তাতে। অর্শ বাইরে নির্গত হলে প্রথমে ধুয়ে পরিষ্কার করে বরফের সেঁক দিয়ে তা খানিকটা সঙ্কুচিত করে আঙুলের সাহায্যে ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা :

নাক্স-ভমিকা : অতিরিক্ত চা, কফি বা মদে আসক্ত। শারীরিক পরিশ্রম হয় না, ব্যথার বেগ থাকে, কিন্তু ব্যথা হয় না। প্রায় রক্ত পড়ে, মলদ্বার কুট কুট করে বা চুলকায় প্রভৃতি লক্ষণে।

হ্যামামেলিস : রক্তাংশ খুব ফলপ্রদ যদি প্রদাহ বর্তমান থাকে। সেই সঙ্গে থাকতে পারে টাটানি ব্যথা। রক্তস্বল্প বা রক্তহীন মলদ্বার জ্বালা করে বা চুলকায় কোষ্ঠকাঠিন্য।

সালফার : পুরাতন অর্শ, মলদ্বারের হুল ফোটানো বেদনা, জ্বালা কুটকুট করা সেই সঙ্গে জ্বালা হাতের তালুতে, ব্রহ্মতালুতে ও পায়ের তলাতে—এইসব উপসর্গে।

পিওনিয়া : মলত্যাগের পর ভীষণ যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় রোগী ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়। অর্শ ফোটা ফুলের মতো দেখায় প্রভৃতি লক্ষণে দেওয়া যেতে পারে।

কলিস্টেবিনা : মলদ্বারে অস্বস্তিবোধ, কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য পেট ব্যথা, পেট সব সময় বায়ুতে পূর্ণ। বেশি রক্তস্রাব হওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

ইস্কুলাস হিপ : অর্শে রক্ত থাকে না বা অল্প থাকে। মলদ্বারে অস্বস্তিবোধ, মলত্যাগের পরে মলদ্বারে জ্বালা, রক্তহীন বা স্বল্পরক্ত, মলদ্বারের আগুনে পোড়ার মতো জ্বালা, গরম সেঁকে উপশম প্রভৃতি লক্ষণে দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

র‍্যাটেনহিয়া : রক্তস্রাব অল্প, কিন্তু মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা, জ্বালার পরমুহূর্ত থেকে উত্তাপে উপশম প্রভৃতি লক্ষণে।

কার্ডুয়াস মেরিনাস : যকৃতের দোষজনিত অর্শে উপকারে আসে।

লাইকোপডিয়াম : যকৃতের দোষজনিত অর্শে যদি রোগের বৃদ্ধি ঘটে অপরাহ্নে, পেটে বায়ুর প্রকোপ থাকে এবং রোগী গরম ভাত খেতে ভালোবাসে।

সাইট্রিক অ্যাসিড : প্রচুর উজ্জ্বল রক্তস্রাব, খিটখিটে লক্ষণে।

এরকম অসংখ্য ওষুধ আছে হোমিও শাস্ত্রে। লক্ষণ অনুযায়ী যে-কোনো ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কখনওই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া খাওয়া উচিত নয়, কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করেন। যা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। (ফোন : ৯৮৩০০২৩৪৮৭)■

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সম্মেলন

গত ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি মালদা শহরের অরবিন্দ পার্ক সরস্বতী শিশুমন্দিরে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের ৯ম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ২৫০ জন শিক্ষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সহসভাপতি ড. অশোক সিংহ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সংস্কৃত ভারতীর সম্পাদক ড. জেপি সিংহ, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রকার্যকারিণীর সদস্য সত্যনারায়ণ মজুমদার, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. চক্রধর ত্রিপাঠী। সম্মেলনে ৬টি প্রস্তাব গৃহীত এবং নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

রাজ্য কমিটি ২০১৭ : সভাপতি --- অবীনভূষণ মণ্ডল, সহসভাপতি--- পঙ্কজ কুমার নিয়োগী, হরেন্দ্রনাথ পাল, বিমলেন্দু দাস, তপন মণ্ডল, সম্পাদক— অরূপ সেনগুপ্ত, যুগ্ম সম্পাদক— বিদ্যুৎ মজুমদার, আশিস কুমার মণ্ডল, সহ সম্পাদক— সহদেব সাহা, অজিত পাল, গৌরাঙ্গ দাস, বামাচরণ রায়। কোষাধ্যক্ষ— গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সদস্যা— নবীনতা কুণ্ডু, পম্পা দাস ও বিথিকা মৃধারায়।

কালিয়াচকে পরিবার প্রবোধনের বনভোজন

গত ৮ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রেরণায় পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে কালিয়াচক মহকুমার এক পারিবারিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয় মালদহ জেলার ধুলিয়ানচরের পারলালপুরের গ্রামে। কালিয়াচকের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৫০টি পরিবার থেকে ২০৩ জন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, কালিয়াচক মহকুমার পরিবার প্রবোধন প্রমুখ শিবু ভৌমিকের পরিবার থেকে ১১ জন এবং কালিয়াচক ও গোলাপগঞ্জ খণ্ড শারীরিক প্রমুখ ডাঃ বিপ্লব স্বর্ণকারের পরিবার থেকে ৮ জন অর্থাৎ পূর্ণ পরিবার অংশগ্রহণ করে। বনভোজনে হিন্দুপরিবারের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন স্বস্তিকা পত্রিকার সহ সম্পাদক সুকেশ মণ্ডল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন মহকুমা কার্যবাহ তথা বিশিষ্ট

অর্শ চিকিৎসক ডাঃ ভূদেব চন্দ্র সাহা বনভোজনের শেষলগ্নে পারলালপুর এলাকার দু'শো দুঃস্থ মানুষকে কম্বল দান করেন। বনভোজনে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের মালদা জেলা প্রচারক মলয় দত্ত এবং উত্তরবঙ্গপ্রান্ত হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সংযোজক রাজু কর্মকার।

বলাগড়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রখণ্ড সম্মেলন

গত ২৫ ডিসেম্বর শ্রীপুর বাজারে সচ্চিদানন্দ আশ্রমে সারাদিন ব্যাপী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বলাগড় প্রখণ্ডের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৫০ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সাংগঠনিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন হুগলী জেলার পরামর্শদাতা কমিটির প্রধান সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য। সংগঠনকে দৃঢ় করার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলার প্রচার প্রমুখ অভিজিৎ রায় চৌধুরী।

এছাড়াও ননীগোপাল দাস, বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্রখণ্ড সভাপতি তপন মুখার্জি।

মালদার হরিপুরে সারদা শিশুনিকেতনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া উৎসব

গত ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর মালদা জেলার গাজোলের হরিপুরে শ্রীমতী দৈবকীদেবী সারদা শিশুনিকেতনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বার্ষিক ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিশুনিকেতনের সভাপতি তথা বিদ্যালয়ের ভূমিদাতা তারাপদ সরকার। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন মালদা নেতাজী সুভাষ রোডস্থিত সরস্বতী শিশু মন্দিরের আচার্য তথা স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি পরেশচন্দ্র সরকার।

বিশেষ অতিথির দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বলন ও মা সরস্বতীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। শিশু মন্দিরের ভাই-বোনেরা নৃত্য, গীত, আবৃত্তি, ভাষণ প্রভৃতির মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপন করে। ৩০ তারিখে হরিপুর ক্রীড়াঙ্গনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

শ্রদ্ধানিধি

মেদিনীপুর জেলার মাদপুর খণ্ডের চনশ্বরপুর শাখার স্বয়ংসেবক প্রশান্ত কুমার মাইতির পিতা স্বর্গীয় পুলিনবিহারী মাইতির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তাঁর মাতা নীহারকণা মাইতি শ্রদ্ধানিধি অর্পণ করেন মেদিনীপুর নগর সেবা প্রমুখের হাতে। শ্রদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ সম্পর্ক প্রমুখ সুনীল ঘোষ সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

বর্ধমানে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের স্মারকলিপি প্রদান

গত ৪ জানুয়ারি ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের বর্ধমান জেলা সমিতি জেলা শাসকের কাছে কৃষকদের স্বার্থে ৫ দফা দাবিপত্র পেশ করে। শতাধিক সদস্য বর্ধমান রেল স্টেশন থেকে মিছিল করে জেলা শাসকের অফিসে উপস্থিত হন। জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রাজ্য সমিতির সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ কুমার মণ্ডল, রাজ্য সংগঠন সম্পাদক অনিলচন্দ্র রায়, জেলা সভাপতি পরমানন্দ গোস্বামী প্রমুখ।

মালদায় বি এম এসের আলোচনা সভা

গত ৪ জানুয়ারি ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের অনুমোদিত মালদহ ডিভিশনের হকার সঙ্ঘের উদ্যোগে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় মালদা অরবিন্দপার্ক সরস্বতী শিশুমন্দিরে। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বি এম এসের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি কৈলাশনাথ শর্মা, রাজ্য সম্পাদক তপন দাস ও প্রদীপ কোলে। সেমিনারে হকারদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

শোকসংবাদ

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক তথা উত্তরবঙ্গ প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ প্রবীর কুমার মিত্রের পিতৃদেব মাখন মিত্র গত ৯ জানুয়ারি বার্ধক্যজনিত কারণে পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৩ পুত্রবধূ, ১ কন্যা, ১ জামাতা ও নাতিনাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি জনসঙ্ঘের আমলে ওয়ার্ডপ্রেসিডেন্ট এবং পরে বিএমএসের দায়িত্ব পালন করেন।

শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ সেবাভারতীর রক্তদান শিবির

গত ১ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতীর উদ্যোগে শিলিগুড়ি মাধব ভবনে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ জন পুরুষ ও ৬ জন মহিলা-সহ মোট ৩৩ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত তরাই ব্লাডব্যাঙ্ক গ্রহণ করে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-বিভাগ সঙ্ঘচালক কুলছত্রপ্রসাদ আগরওয়াল, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক জলধর মাহাতো, ক্ষেত্র প্রচারক প্রমুখ রমাপদ পাল। রক্তদান সম্পর্কে উৎসাহিত করেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অশোক মুখার্জী।

ধুলাগড়িতে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর হাওড়া জেলার ধুলাগড়িতে জেহাদি দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বহু হিন্দু পরিবার ঘরছাড়া হয়ে খোলা আকাশের নীচে বসবাস করছেন। সহায় সম্বলহীন অসহায় পরিবারগুলিকে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দান করেন ধুলাগড়ি চৌরাস্তা মনসাতলা শিবকালী মন্দির কর্তৃপক্ষ। মন্দিরের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ত্রাণ শিবির গত ১৭ ডিসেম্বর থেকে চলছে। যেখানে প্রায় ৬০-৭০ জনকে দু'বেলা ভোজন, শীতবস্ত্র-সহ নানা উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করা হয়। এছাড়া ধুলাগড়ি আটচালা ও মধ্যমপাড়াতে আক্রান্ত হিন্দুপরিবার-সহ দুঃস্থ অসহায় ২০০ মহিলা পুরুষকে বিশ্বহিন্দু পরিষদের মানব সেবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কম্বল, শাড়ি ও গামছা প্রদান করা হয়। মানবসেবা প্রতিষ্ঠানের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি নন্দলাল লোহিয়া, পরিষদের হাওড়া জেলার প্রবীণ কার্যকর্তা সুজয় ঘোষ, নীলমণি মান্না, নিমাই মালিক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ শুভেন্দু সরকার উপস্থিত থেকে ত্রাণ কাজ পরিচালনা করেন।

অরুণাচল বিকাশ পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন

গত ২৬ ডিসেম্বর অরুণাচলের ইটানগরে অরুণাচল বিকাশ পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অন্যতম স্থপতি বালাসাহেব দেশপাণ্ডের জন্মদিবস উপলক্ষে ইটানগরের সিদ্ধার্থ সভাগৃহে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ৩০০ শিশু-সহ প্রায় ৭০০ দর্শক উপস্থিত ছিলেন। শিশুদের নাচে-গানে-আবৃত্তিতে যোগ ও ক্রীড়া প্রদর্শনে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল প্রাণবন্ত। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অরুণাচল প্রদেশের প্রান্ত প্রচারক তথা জে এন ইউ-র প্রাক্তন অধ্যাপক সুনীল মহান্তি প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। স্থানীয় ১২টি বালওয়াড়ি (শিশু শিক্ষাকেন্দ্র)-র শিশুরা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী শিশুদের পুরস্কার দেওয়া হয়। পরিষদের প্রান্ত শিক্ষা প্রমুখ শারদ আনসিঙ্গকর স্বর্গীয় দেশপাণ্ডেজীর জীবন ও কর্ম তুলে ধরার পাশাপাশি অরুণাচলে সংগঠনের কাজকর্মের বিষয়টিও বর্ণনা করেন। পরিষদের প্রান্ত সংগঠন প্রমুখ নিবারণ মাহাতো সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

শোকসংবাদ

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক তথা এক সময়ের স্বস্তিকার নিষ্ঠাবান প্রচার প্রতিনিধি

অরবিন্দ দে (বিন্দু) গত ১ জানুয়ারি কর্মরত অবস্থায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন।

এবার শীতে তিন গোয়েন্দা

বিকাশ ভট্টাচার্য

এবার শীতের কলকাতায় ফেলু মিত্তিরের জোড়া অ্যাডভেঞ্চার। সত্যজিতের জটায়ু সন্তোষ দত্ত মারা যাবার পর সত্যজিত ফেলুদা সিরিজ বন্ধ করে দেন। অনেক পরে পুত্র সন্দীপ ফেলুদা চরিত্রে সব্যসাচী চক্রবর্তী ও জটায়ুর ভূমিকায় বিভু ভট্টাচার্যকে নিয়ে একের পর এক বোম্বাই-য়ের বোম্বেটে, টিনটরেটার যিশু, কৈলাশে কেলেঙ্কারি প্রভৃতি ছবি করে জমিয়ে দিলেন। কিন্তু বিভু মারা যাবার পর তিনিও গত বছর থেকে জটায়ুহীন ফেলুদা কাহিনির দিকে হাত বাড়িয়েছেন।

সব বয়সী, ছোট-বড় পাঠকের প্রিয় গোয়েন্দা ফেলু মিত্তির ওরফে প্রদোষ মিত্রর রহস্য রোমাঞ্চ অ্যাডভেঞ্চার। গোয়েন্দা গল্প বাংলায় কম লেখা হয়নি। কিন্তু এমন টানটান, বাহুল্যহীন কাহিনি তেমন আর কই! শুধু অ্যাডভেঞ্চার নয় সেই সঙ্গে জটায়ুর উপস্থিতি মানেই অজস্র মজা। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৬৫-তে সন্দেশ পত্রিকায় প্রথম ফেলুদা কাহিনি প্রকাশ পায়। তাই পঞ্চাশ বছরে সন্দীপ রায় ফেলুদার প্রতি, ফেলুদার স্রষ্টার প্রতি সম্মান জানাতে একটি ছবিতে দুটি ফেলুদা কাহিনি অর্থাৎ 'সমাদ্দারের চাবি' ও 'গোলকধাম রহস্য' নিয়ে করেছেন 'ডবল ফেলুদা'। ডবল রহস্য— ডবল সমাধান। ফেলুদার ভূমিকায় নিয়ে এসেছেন তাঁর পুরনো ফেলুদা— সব্যসাচী চক্রবর্তীকে। তিনি ছবিটা সত্যজিতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবেই দেখছেন! অনেকটা মেদ ঝরিয়েছেন। দেখতেও খুব বেমানান লাগেনি। 'ডবল ফেলুদা'তে সিধুজেঠা হয়েছেন পরান বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাধারমণ সমাদ্দার ছিলেন উকিল। প্রচুর পয়সা করেছেন। হঠাৎ একদিন কলকাতা ছেড়ে বামুনগাছিতে গিয়ে থাকতে শুরু করেন। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখতেন না। স্বভাবে কৃপণ রাধারমণ কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রাখতেন না। সব নগদ লেনদেন করতেন। হঠাৎ তিনি মারা যান। খবর পেয়ে তার ভাইপো মণিমোহন (ব্রাত্য বসু) বামুনগাছি গিয়ে অনেক চেষ্টা করেও তার কাকার নগদ টাকা পয়সার হদিশ না পেয়ে ফেলুদার স্মরণাপন্ন হয়েছেন। 'সমাদ্দারের চাবি' রাধারমণের টাকা খুঁজে বের করার কাহিনি।

নীহার দত্ত (ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়) এককালে বায়োকেমিস্ট্রিতে খুব নাম করেছিলেন। আমেরিকার মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে ল্যাবে কাজ করতে করতে একটা এক্সপ্লোশানে তাঁর দুটি চোখেই চলে যায়। অন্ধ নীহার দত্ত অসমাপ্ত গবেষণার কাগজপত্র এবং বেশ কিছু অর্থ নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর ঘরের স্টিল আলমারিতে সব থাকতো। তাঁকে মাইন্স ম্যাগাজিন ও কাগজ পড়ে শোনাতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রির মেধাবী ছাত্র রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (গৌরব চক্রবর্তী)। নীহারবাবুর বাড়ি একতলায় দুটি ফ্ল্যাটে থাকে দু'জন অবাঙালি ভাড়াটে। একদিন রাতে নীহারবাবুর ঘরে চোর আসে। আলমারি খোলার চেষ্টা করে। কিন্তু অসফল হয়ে পালায়। নীহারবাবুর ছোটভাই সুবীর (ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) ফেলুদাকে নিয়ে আসে। ফেলুদার তদন্ত চলাকালীনই হঠাৎ লোডশেডিং এবং আলো আসার পর দেখা গেল আলমারির লকার থেকে গবেষণার কাগজপত্র এবং সমস্ত নগদ টাকা চুরি হয়ে গেছে। কে এই চোর? এই নিয়েই 'গোলকধাম রহস্য'। মুম্বইয়ের ইরস ইন্টারন্যাশনাল এ ছবির প্রযোজক। চিত্রনাট্য সঙ্গীত ও পরিচালনায় সন্দীপ রায়। ক্যামেরায় শীর্ষ রায়। সম্পাদনা সুব্রত রায়। 'ডবল ফেলুদা' দেখার উপরি পাওনা ছবি শেষে ফেলুদা ছবির সব চরিত্রকে একটি কোলাজে দেখা যাবে। সোনার কেল্লায় মুকুল, তপসে সিদ্ধার্থ। দীপঙ্কর দে, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়। এরকম আরও অনেকে তাদের ফেলুদা কাহিনিতে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ কাহিনি নিয়েও ইদানীং খুব টানাটানি। ঋতুপর্ণ ঘোষ, অঞ্জন দত্তের পরে এখন অরিন্দম শীল। মুম্বইতেও হিন্দিতে ব্যোমকেশ কাহিনি নিয়ে ছবি হয়েছে। এবার শীতে অরিন্দম শীল 'ব্যোমকেশ পর্ব' নাম দিয়ে ব্যোমকেশের একটি কাহিনিকে রূপ দিয়েছেন। গত বছর 'হর হর ব্যোমকেশ' করেই তিনি সকলের নজর কেড়েছেন। এবারের কাহিনিটি স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরের।

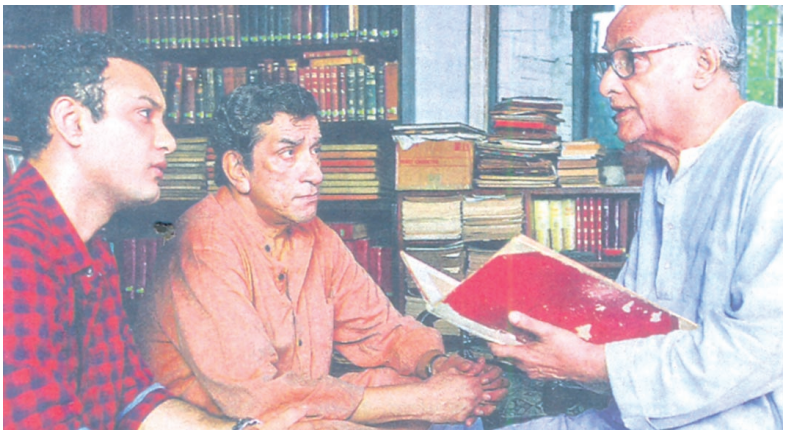

এবার সিধুজেঠা পরান বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেআইনি অস্ত্র (ইংরেজদের রেখে যাওয়া) কারবারিদের রমরমা কমাতে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ব্যোমকেশকে পাঠানো হয়। তিনি কীভাবে অস্ত্র চোরাকারবারিকে ধরলেন তাই নিয়েই গল্প। মূল তিনটি চরিত্রে ব্যোমকেশ আবীর চট্টোপাধ্যায়, সত্যবতী মোহিনী সরকার এবং অজিত ঋত্বিক চক্রবর্তী খুব ভালো। সন্দেহভাজনদের ভূমিকায় রজতাভ দত্ত, শুভাশিস মুখার্জী ও কৌশিক সেন যথাযথ। এছাড়া জুন মালিয়া, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ও আছেন। ছবির চিত্রগ্রহণ সৌমিক হালদারের নিসর্গ দৃশ্য অপূর্ব। সঙ্গীতে বিক্রম ঘোষ। কলকাতার বাঈজীপাড়ায় চটুল ঠুংরি ও সত্যবতীর কণ্ঠে একটি বাংলা গান সুপ্রযুক্ত। বামলা গানের সুরটি অপূর্ব। চিত্রনাট্য পদ্মনাভ দাশগুপ্তকে নিয়ে পরিচালক নিজেই করেছেন। পরিচালনায় অরিন্দম শীল এবারও নজর কাড়লেন। আমাদের ছাত্রাবস্থায় শশধর দত্ত, পাঁচকড়ি দের পরেই আমাদের গোয়েন্দা কাহিনিতে আগ্রহ বাড়িয়েছেন হেমেন্দ্র কুমার রায় ও অবশ্যই ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্ত। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনি 'সেতারের সুর' নিয়ে এসেছেন অনিকেত চট্টোপাধ্যায়। কিরিটি রায় কীভাবে রহস্যভেদ করলেন তা নিয়েই অশোক ধানুকা ও কৌস্তভ রায় প্রযোজিত এই ছবি। ■

শব্দরূপ-৮১৮ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১			২	৩	■	■	৪
৪	■	■	৫		■	■	
	■	■	৬		■	৭	
৮	৯	■	■	১০		১০	■
■	১১		১২	■	■	১৩	১৪
১৫		■	১৬	১৭	■	■	
	■	■	১৮		■	■	
	■	■	১৯				

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. ত্রিপুরার রাজধানী, **৫.** ক্রোধ, **৬.** বিস্ময় দুঃখ ক্লেশ ইত্যাদি সূচক শব্দ, **৭.** হিন্দি প্রতিশব্দে সাধু, **৮.** চড়ক পর্বে শিবব্রত বিশেষ, **১০.** ইতিহাস বিখ্যাত গুহা মন্দির, **১১.** লিপি, লেখ ('ললাটের —'), **১৩.** সূর্য (অগ্রহায়ণে পূজা হয়), **১৫.** জনক-কন্যা, জানকী, **১৬.** — খরচ, **১৮.** কৃষ্ণের প্রিয়া, **১৯.** মৌলিক গ্যাস বিশেষ; বায়ুর অন্যতম উপাদান।

উপর-নীচ : ১. উমার পিত্রালয়ে আগমন বিষয়ক গীতি, **২.** পর্বতের নিম্নদেশ, **৩.** উপযুক্ত, **৪.** কবিকঙ্কণচণ্ডীর নায়ক; ধনপতি সদাগরের পুত্র, **৭.** পান্থশালা, **৯.** রাধিকার সখী বিশেষ, **১২.** ভেট, উপঢৌকন, **১৪.** দাতার ওজনের সমান অর্থাদি দান, **১৫.** সিঁথি, **১৭.** মাধবের ডাক নাম।

সমাধান
শব্দরূপ-৮১৫
সঠিক উত্তরদাতা

সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম
সঞ্জয় পাল
সাহাপুর, মালদা

শি	রো	পা	■	বু	ল	বু	ল
লী	■	গ	■	হি	■	■	ক্ষ্ম
ন্ধ্র	■	ল	লি	তা	■	■	ণা
■	■	পা	■	ল	ব	■	■
■	■	রা	ম	■	র	■	■
জৈ	■	■	ক	ন	ক	■	শি
মি	■	■	র	■	ন্দা	■	রা
নি	ত্যা	ন	ন্দ	■	জ	টি	লা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৮১৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

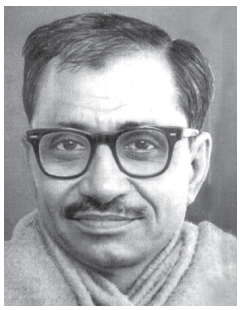

যত দিন ইংরেজি ভাষা চলতে থাকবে ততদিন আমরা নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবনদায়িনী হাওয়াতে শ্বাস নিতে পারব না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রাপ্ত না করার বিপদ থেকে ও বিদেশি ভাষার থাবা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমকে নকল করে বিশ্বকে যদি কিছু সেবা করতে পারি তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি করতে পারি নিজের ভাষার মাধ্যমে।

* * *

ইংরেজির বিরুদ্ধে শুধু হিন্দিভাষীরা লড়াই করছে এ তথ্য ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি সমস্ত ভারতীয় ভাষার সম্মিলিত বিষয়। ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্য দৃঢ় করার জন্য 'বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করা' নীতির সঙ্গে ইংরেজি ভাষাকে মাধ্যমে করে। ইংরেজি বিদায় হলে সেই স্থান শুধু হিন্দিই গ্রহণ করবে না বরং সমস্ত ভারতীয় ভাষা মিলিতভাবে গ্রহণ করবে। যদি ইংরেজি এদেশে টিকে থাকে তাহলে কোনো ভারতীয় ভাষা বিকশিত হতে পারবে না। বাংলা কিংবা অন্য কোনো ভাষাকে কখনো হিন্দি হেয় করেনি। কেউ ভাবছেন না যে, কেরলে বিধানসভা ও প্রশাসনের সমস্ত কাজকর্ম হিন্দিতে করতে হবে। আসল কথা হলো, ইংরেজি বিদায় না হলে মালয়ালাম সেই স্থান দখল করতে পারবে না।

* * *

আমরা যদি সংস্কৃত পরিত্যাগ করি, তাহলে ভারতীয় ভাষার পারিভাষিক শব্দের সাধারণ ভিত্তি কী হবে? ইংরেজি যদি আমরা রেখে দিই তাহলে শুধু সর্বনাম ও কাল বদল করতে হবে। যেমন মুগলরা ফারসি থেকে উর্দু করার সময় করেছে। ফারসিকৃত হিন্দি আমাদের উদ্দেশ্যে পূরণ করতে পারেনি। ইংরেজিকৃত হিন্দিও তা পারবে না। অর্ধশিক্ষিত নগরবাসী ওই ভাষায় কথা বলতে পারবে, কিন্তু তার দ্বারা সরকারি কাজ বা সাহিত্য সৃষ্টি করা যাবে না।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ১৯

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

আই আই টি খড়্গপুরের প্রাক্তন ছাত্রের প্রযুক্তি-অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আই আই টি খড়্গপুরের প্রাক্তন ছাত্র পরাগ হাবলদার প্রযুক্তিবিদ্যায় বিশেষ অবদানের জন্য সম্প্রতি অস্কার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি অস্কার আকাদেমি তার হাতে পুরস্কার তুলে দেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হলিউডের সিনেমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ কলাকুশলীদের অস্কার পুরস্কার দেওয়া হয়। হলিউডের সিনেমায় ভাবগত সুষমা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে বরাবর। এই ভাবেই আমরা পেয়েছি অ্যানিমেশন ফিল্ম। সেই কবে, ১৯৩১ সালে প্রথম প্রযুক্তিগত রূপায়ণে অসামান্য অবদানের জন্য অস্কারের মঞ্চ থেকে প্রযুক্তিবিদদের পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়েছিল। পরাগ হাবলদার একজন দুর্ধর্ষ অ্যানিমেটর। তার কাজ করা ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে : ওয়াচম্যান (২০০৯), গ্রিন ল্যান্টার্ন (২০১১), দা অ্যামেজিং স্পাইডারম্যান (২০১২), বেউলফ (২০০৭), হ্যানকক (২০০৮) এবং আর্থার ক্রিসমাস (২০১১)। সিনেমায় কাজ করা ছাড়াও পরাগ দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক সময়ের অধ্যাপক।

কাশ্মীরি যুবকদের মনোভাব পাল্টাতে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এই সেদিনও যারা নিরাপত্তাবাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ত তাদের মনোভাবে পরিবর্তন আনার জন্য কার্যক্রম শুরু করল মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ। মঞ্চের কর্মীরা জম্মু ও কাশ্মীরের মহল্লায়-মহল্লায় ঘুরে যুবকদের সঙ্গে কথা বলছেন। তাদের ক্ষোভের উৎস খোঁজার চেষ্টা করছেন। মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের জম্মু-কাশ্মীর শাখার আহ্বায়ক নাজির মির বলেন, 'আমরা ওদের মনোভাব বদল করার চেষ্টা করছি। ওদের মধ্যে যারা ভালো ছাত্র আমরা তাদের জন্য বৃত্তি, ফ্রি কোচিং, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং চাকরির ব্যবস্থা করব। এছাড়া পুলিশ, সিআরপিএফ, সেনাবাহিনী বা অন্য কোনও এজেন্সির কেউ যাতে ওদের হয়রান না করে সেটাও আমরা দেখব।' মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ একটি লিগ্যাল সেল গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেসব যুবকের বিরুদ্ধে পাথর ছোড়ার অভিযোগ রয়েছে তাদের আইনগত বিষয়গুলি দেখাশোনা করবে এই সেল। কাশ্মীরের যেসব ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী তাদের বিশেষ বৃত্তি দেওয়ার জন্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে সুপারিশ করেছে মঞ্চ। এছাড়া ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর প্রোমোশন অব উর্দু ল্যাঙ্গোয়েজের প্রদত্ত অর্থে সমগ্র উপত্যকায় ৭০টি কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হবে।

চীনা খাবার খেয়ে প্রাণ সংশয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আবার অভিযুক্ত আজিনামোতো লবণ। যার বৈজ্ঞানিক নাম মোনোসোডিয়াম গ্লুটামেট। সাধারণত এই লবণ চীনা খাবারে দেওয়া হয় স্বাদ বাড়ানোর জন্য। কিন্তু ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে জানা গেছে, সম্প্রতি তেইশ বছর বয়সি এক যুবক চীনা রেস্তোরাঁয় ফ্রায়েড রাইস খাবার পর হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রবল শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় তার। সেই সঙ্গে ঢোক গেলা এবং কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। মহারাষ্ট্রের মোহাদের জেনালের হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ড. হিমন্ত বাওসকর পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর জানতে পারেন তাঁর পাকস্থলীতে যথেষ্ট মাত্রায় আজিনামোতো লবণ রয়েছে। অর্থাৎ শেষ যে খাবার তিনি খেয়েছিলেন তাতে এই লবণ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে আজিনামোতো লবণ (মোনো সোডিয়াম গ্লুটানেট) ক্যান্সারের সম্ভাবনা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। ফুসফুস, স্বরযন্ত্র এবং স্নায়ুরও ক্ষতি করে। পৃথিবীর অনেক দেশে খাবারে আজিনামোতো লবণ দেওয়া হলে তা ক্রেতাকে আগেভাবে জানানো বাধ্যতামূলক। সুতরাং চীনা রেস্তোরাঁয় ঢোকার আগে সতর্ক হওয়া জরুরি। ■

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
16 January - 2017 - Rs. 10.00,

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

Wide beam angle for better light spread

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০ টাকা ।।